আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ঊনপঞ্চাশৎ গ্রন্থ

মনোরমা

শ্রীসরসীবালা বসু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা.

পৌষ—১৩৩০
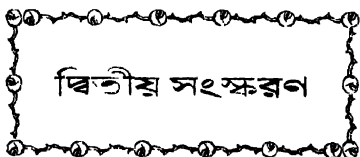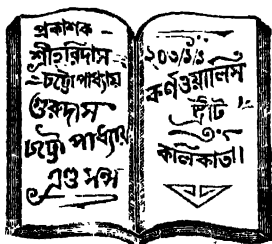
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়

কুশদহ-সম্পাদক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

আমার অনাদৃতা উপেক্ষিতা,

মনোরমাকে

আপনার চরণে দিলাম।

আপনার স্নেহের
"সরসী"

মনোরমা

১

প্রৌঢ় রমাকান্ত বাবু মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হার্ম্মোনিয়াম লইয়া বসিলেন। নিজে দু' একটি শ্যামাবিষয় গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া, উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "মা মিনু, আয় মা।" রুনু ঝুনু মল বাজাইয়া একটি তন্বঙ্গী কিশোরী গৃহমধ্যে আসিয়া মধুরকণ্ঠে কহিল, "বাবা, ডাকছ?"

"হ্যাঁ মা, সেই নূতন গানটা যে শিখেছিস্ গেয়ে একবার শোনা তো মা।" বালিকা পিতার পার্শ্বে বসিয়া মৃদু-মধুর-কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

"পদপ্রান্তে রাখ সেবকে,
শান্তিসদন, সাধন ধন হে,"

গায়িকার মধুর স্বর হার্ম্মোনিয়ামের পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া নামিয়া খেলা করিতে লাগিল, ভক্ত রমাকান্ত তন্ময়-চিত্তে বাজাইতে লাগিলেন। গানের অপূর্ব্ব ভাবে তাঁহার চিত্ত আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। মনোরমা গাহিতে গাহিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। রমাকান্ত বাবু ত্রস্তভাবে

কহিলেন, "আহা হা, থামলি কেন মিনু, কি সুন্দর গানটি মা, প্রাণ ভরে আবার গা।"

মনোরমা পুনরায় গাহিতে লাগিল, কিন্তু গান আর তেমন জমিল না, সুর কেবলই ভুল হইতে লাগিল। রমাকান্ত বাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি করিস পাগলী, ঘুম পাচ্চে না কি ? এমন ভাবপূর্ণ সঙ্গীত একটু স্থির হয়ে ধৈর্য্য ধরে গাইতে পারলি না ? আচ্ছা সন্ধ্যের সময় আবার গাস, এখন যা, খেলা কর গে।"

মনোরমা চকিতে আর একবার বাহিরের জানালার দিকে চাহিয়া গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইল।

মনোরমার জননী সুখময়ী তখন আহারান্তে পান খাইতে খাইতে শুপারি কাটিতেছিলেন। দয়া ঝি তাঁহার একরাশি চুল ফুলাইয়া দিতে দিতে মিনুদিদির বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিল। মনোরমাকে সে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে যাহাতে ভাল ঘরে বরে পড়িয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তাহাই তাহার আন্তরিক কামনা।

এমন সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঘটকী সৌরভী তাহার বিপুলদেহ দোলাইয়া স্বর্ণবলয় তাগামণ্ডিত হাত দু'টি নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহিণী, "এস মা এস" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। দয়া ঝি "এস দিদি, অনেক দিন বাঁচবে, এখনি তোমার নাম হোচ্ছিল" বলিয়া সম্ভাষণ করিল, সৌরভী জাঁকিয়া বসিয়া কহিল ;—

"আর মলেই বাঁচি দিদি, লোকের গা'ল খেয়ে আর শাপমন্নি কুড়িয়ে কত দিন আর বাঁচবো ?"

"বালাই, মরবে কি দুঃখে দিদি, দু'ঠেঁয়ের মানুষ এক ঠেঁই করতে, চার হাত এক জায়গায় করতে তোমরাই তো আছ। প্রজাপতি দেবতা তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন, তোমরা ম'লে লোকে বৌ জামাইয়ের মুখ দেখবে কাদের কৃপায় ?"

দয়ার এহেন সুযুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া সৌরভী অত্যন্ত খুসি হইয়া কহিল, "তুমি যা বলেছ তা তো ঠিক, কিন্তু পোড়া লোক সবাই কি তা মনে করে ? বিয়ের দশ বিশ বছর পরেও যদি কুটুমের কি বৌ জামাইয়ের কিছু খুঁৎ বেরুলো তো অমনি ঘটকীকে দু'শো গালাগালি ; আমরা তো জানৎ পক্ষে কারও মন্দ জুটিয়ে দিই না, তার পর আপন আপন অদৃষ্ট।"

"সে তো বটেই বোন, কথায় বলে অদৃষ্টের লিখন, না যায় খণ্ডন, এখন আমাদের মিনুর যে পাত্রটির খবর এনেছিলে সে কি হোলো ?"

সুখময়ী কহিলেন, "হ্যাঁগা বাছা, সে ঘর বেশ জানা শোনা তো ? আমার তো তেমন আপনার জন কেউ নেই যে ভাল করে খুঁটিয়ে খবর আনবে, উনিতো সদাশিব, এক কথাতেই হ্যাঁ দিয়ে বসবেন।"

সৌরভী বিজ্ঞতার সহিত কহিল, "বল কি মা, তোমরা

কি আমার পর? যে জায়গার সম্বন্ধ এনেছি, ছেলে নিজেই মেয়ে দেখতে আসবে, রূপে যেন কার্ত্তিকটী, দু'টো পাশ, বছরে বিশ হাজার টাকা জমিদারীর আয়, মেয়েকে হীরে মুক্ততে মুড়ে নিয়ে যাবে, বাপ নেই মা আছে, মায়ের ঐ এক ছেলে, আর একটী মেয়ে, মেয়েটীও তেমনি বড়-লোকের ঘরে পড়েছে, তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে মা, কিছু ভেবো না, কাল সকালে আমি ছেলেকে নিয়ে আসব তাঁরও মেয়ে দেখা হবে, তোমারও ছেলে দেখা হবে।"

সুখময়ী সানন্দে সম্মত হইলেন, এমন সময়ে চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় মনোরমা নিজের পোষা ময়ূরটি তাড়াইতে তাড়াইতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৌরভী আনন্দা-মূর্ত্তি কিশোরীর দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, মেয়ে যেমন গৌরীর মতন, তেমনি মহাদেব জামাই হবে, হর-গৌরী মিলন দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করবো।"

সুখময়ী হাসিয়া কহিলেন, "মহাদেবের মতন নেশাখোর যেন হয় না বাছা, তা দেখো।"

২

মাতা নির্জ্জন গৃহে ফর্দ্দ করিতেছেন। কন্যা মাতার কোলে মুখ লুকাইয়া কহিল, "মা, তোমরা আমার বিয়ে দিও না, আমি তোমাদের ছেড়ে যাব না।"

জননী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "পাগল মেয়ে,

বলিস কি? বিয়ে না করলে কি মেয়ে জন্ম কাটে? তাতে অমন সুন্দর, রূপে গুণে ধনে মানে জামাই পাচ্ছি, ছি মা, তুমি লেখা-পড়া শিখেচ, এই কি বুদ্ধিমতীর মতন কথা? যেটের পনের বছরে পড়েছ, এ বয়সে মেয়েরা ছেলের মা হয়!"

"কেন মা? পুলিনা, নির্ম্মলা. ওদের তো এখন বিয়ে হবে না, ওরা তো আমার চাইতে বড়?"

"ওদের কথা আলাদা, আমরা হিন্দু, ওরা ব্রাহ্ম, ওদের ঘরে বিয়ে না হলেও নিন্দে নেই। ওসব তুলনা করতে নেই, ভালোয় ভালোয় বিয়ে হোক, স্ত্রীলোকের স্বামী সেবার চাইতে আর ধর্ম্ম নেই, মেয়ে জন্ম ওতেই সার্থক হয় মা।"

মনোরমা উঠিয়া গেল, সুখময়ীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি মনে করিলেন পিতৃমাতৃ ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসন আশঙ্কায় কন্যার কোমলচিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। হায় হায়! তাঁহারও কি ততোধিক কষ্ট হইবে না? সে তো নূতন পরিজন মধ্যে, নূতন স্নেহ-বেষ্টনীতে শীঘ্রই সান্ত্বনা লাভ করিবে, আর তাঁহাদের গৃহের একমাত্র আনন্দ-পুত্তলী স্বর্ণ-প্রতিমা মনোরমা চলিয়া গেলে এ গৃহ কি অরণ্য তুল্য হইয়া পড়িবে না? জননীর দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। তিনি শুভকার্য্যে অমঙ্গল আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

৩

ফুলশয্যার রাত্রে আনন্দোৎফুল্ল সন্তোষ, স্বর্ণলঙ্কার-বিভূষিতা, নানাপুষ্পাভরণা নববধূকে সাদরে চুম্বন করিয়া কহিল, "আমায় একটা গান শোনাও, আমি তোমার গানেতেই মজেছি, আমি বড় গান ভালবাসি।"

মনোরমা স্বামীর মুখ নির্গত তীব্র সুরার গন্ধে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সরিয়া গিয়া কহিল, "তুমি মদ খাও? ছিঃ।"

সন্তোষ হা-হা করিয়া হাসিয়া কহিল, "এ কি বড় লজ্জার কথা? তুমি যে বড় গোঁড়া দেখছি? তোমার বাবা কি ব্রাহ্ম না কি? পুরুষ মানুষ মদ খাবে তাতে আবার লজ্জা কি? আচ্ছা, বল দেখি, ক'দিন তুমি আমায় দেখেছিলে? আমি তো তোমায় দেখেই ভালবেসেছিলুম, তুমিও কি বাস নি?"

মনোরমা উত্তর দিল না, স্বামীর স্খলিত কথাগুলি তাহার কানে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। সে যে উপর্যুপরি তিন দিন গান গাহিবার সময়, জানালায় অনতিদূরে সন্তোষকে লুব্ধদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, এবং সে দৃষ্টিতে তীব্র লালসার ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সন্তোষ যখন বন্ধু সঙ্গে কন্যা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহার সুন্দর শ্রী ছাঁদ দেখিয়া সুখময়ী অবশ্য অত্যন্ত প্রীত

হইয়াছিলেন, কিন্তু মনোরমা তখনই তাহাতে কি দেখিয়াছিল যে জন্য, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয় ভাবী পতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে সেই জন্যই সকল সঙ্কোচ ঠেলিয়া জননীকে বলিয়াছিল, মা তোমরা আমার বিবাহ দিও না, কিন্তু হায় নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

মনোরমাকে নীরব দেখিয়া সন্তোষ আবার কহিল, "আমার বুদ্ধিকে তারিফ দিতে হয়, যেমন তোমায় দেখে মোহিত হলুম, অমনি আশ পাশ হতে তোমাদের খবরটা নিয়ে ফেললুম, সোবতী ঘটকীকে নগদ দশ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বড় বকশীসের লোভ দেখিয়ে লাগিয়ে দিলুম, কিন্তু মা বেটি কি বিয়ে দিতে রাজী হয়? কত হাতে পায় পড়ে তবে মাকে রাজী করলুম! আচ্ছা থাক, মনোরমা এখন সত্যি বল দেখি, আমায় পছন্দ হয়েছে কি না?"

মনোরমা তখন আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া, ফুঁপাইয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া সন্তোষ পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিল, "বুড়োধাড়ি মেয়ে, তার আবার কান্না! ওসব প্যান প্যানানী আমি সইতে পারি না। মনে করছিলুম, দু'টো গান টান শুনবো, নতুন গান দু'একটা শেখাব। বাপ তো খালি ব্রহ্মসঙ্গীত শিখিয়েছে বই তো নয়। এ বয়সে কি আর ঐসব ভাল লাগে? দু'টো মধুর রসের গান গাইবে, যাতে প্রাণ তর্ হয়ে যাবে; নাও বাবা, প্রাণ ভরে আগে কেঁদে নাও।"

বাক্যহীনা মনোরমা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রাতে ননদিনী হিরণ্ময়ী আসিয়া সাদরে ভ্রাতৃবধূকে চুম্বন করিয়া কহিল, "বোনটি, একলা কি করছ? মুখ ধুয়ে জল খাবে চল।" ননদিনীর সাদর সম্ভাষণে মনোরমার চক্ষে জল আসিল। গত রাত্রের স্মৃতি আবার তাহার কোমল-চিত্তকে পীড়ন করিতে লাগিল। মনোরমা বালিকা নহে, ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার হইয়াছে। হিরণ্ময়ীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বধূর মনের ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে বুঝিল, এ অশ্রু পিতৃমাতৃ ক্রোড় হইতে সদ্য-বিচ্ছিন্না বালিকার নহে, ইহা নবোঢ়ার কোমল প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রথম তীব্র আঘাতে জাগ্রত বেদনাশ্রু। সহানুভূতিতে হিরণ্ময়ীর প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বধূকে সঙ্গে করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া, দাসীকে তাহার মুখ ধোয়াইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাইবার আদেশ দিয়া মাতা অন্নপূর্ণার গৃহে আসিল।

গৃহিণী বৌভাতের আয়োজন করিতেছিলেন। হিরণ্ময়ী মাতাকে একা দেখিয়া কহিল, "মা, কাল এসে তো কোন কথা বল্‌তে পারিনি, তোমারও কি মা ছেলের সঙ্গে সঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গেছে? যে অমন বৌ নিয়ে ঘর করতে পারলে না, শেষটা তাকে মার ধোর পর্য্যন্ত ক'রে বিদেয় করলে, তারপর আবার একটা অবলা সরলার

সর্ব্বনাশ করতে বসলো ? তুমি তো মা ছেলের গুণ জান ? তবে কেন বিয়ে দিতে রাজী হলে ? আমি যদি বিয়ের দিনও টের পেতুম তা হ'লে কি বাপ মার একমাত্র সোণার প্রতিমাকে এমনি অযোগ্যের হাতে দিতে দিতুম ?"

অন্নপূর্ণা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বাছা, তোমায় তো কতবার আস্‌তে লিখেছি। সন্তোষকে আমি কিছুতেই শাসনে রাখতে পারছি না। দিন দিন আরও উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌ছে। আমাকে আর মোটেই মানে না। বৃদ্ধ দেওয়ানজী, যিনি আমার বাপের বয়সী, তাঁকেও গ্রাহ্য করে না, তোমায় যা একটু ভয় করে, তুমি থাক্‌লে হয়তো কিছু সামলে চল্‌তে পারে। তা তোমরাও আসতে চাও না। বড় বৌটার দুর্গতি দেখে শেষে ভয়ে ভয়ে আমিই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম,—কেন পরের বাছা অপঘাতে মর্‌বে। তার পর আবার বিয়ে করবে বলে ছেলে একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লো। কত বুঝুলুম, কত মানা করলুম, কিছুতেই থামলো না। আমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করলে যে এ বারে বৌ নিয়ে ভালভাবে ঘরকন্না করবে, আর কোনও বদ্‌ খেয়াল করবে না। কত হাতে পায়ে পড়তে লাগলো, কাজেই রাজী না হয়ে করি কি। এখন ভগবানের দয়ায় মতি গতি—"

হিরণ্ময়ী মাতার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমার বোধ হয় এখনও ওর কপালে অনেক দুর্গতি আছে।"

অন্নপূর্ণা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে, তুমি বাছা কিছুদিন এখানে থেকে যাও। বড় টাকা পয়সা ওড়াচ্ছে, দেনা প্রায় হাজার দশেক টাকা হয়েছে, তার তো একটা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। অদৃষ্টে যে কি আছে তা জানি না। একটি ছেলে, তা এমন কুলাঙ্গার হোলো। তাঁর বংশে যে এমন সন্তান হবে এ যে স্বপ্নের অগোচর ছিল।

অন্নপূর্ণার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, মাতাকে কাতর দেখিয়া হিরণ্ময়ী কহিল, "আমায় দু'চার দিনের মধ্যে ফিরে যেতেই হবে। পূজার পরে এসে একটা বন্দোবস্ত করতে হবে বৈ কি। সঙ্গদোষেই এতটা বেগড়াল ; নইলে আগে তো বেশ শান্ত সচ্চরিত্র ছিল, পড়াশুনাও ত বেশ করছিল। সবই আমাদের অদৃষ্টের দোষ মা। এখন এ বৌটিকে সুনজরে দেখবে কি ? তুমি মা ভাঁড়ারের জিনিষ গোছ করে বার করে দাও, আমি একবার রান্নাঘরটা দেখে আসি ”

হিরণ্ময়ী চলিয়া গেল, অন্নপূর্ণা চক্ষু মুছিয়া, মনে মনে সন্তানের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিলেন।

৪

বিবাহের তিনমাস পরে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে নবোঢ়া মনোরমাকে পতিগৃহে আসিতে হইল। সন্তোষ

স্ত্রীকে কহিল, "আমার বন্ধুরা তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে চান, তাঁরা সন্ধ্যার সময় আসবেন, তুমি প্রস্তুত থেকো।"

মনোরমা সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল, "সে হবে না, আমি কারও সঙ্গে আলাপ করতে চাই না।"

"ইস্! এখনই এত ফোঁস্ ফোঁসানি? মেয়ে মানুষের এত তেজ? স্বামীর কথা অমান্য করা? আমার কথা না মেনে চললে কিন্তু ভাল হবে না জেন।"

মনোরমা নিরুত্তরে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। সন্তোষ রাগে জ্বলিয়া উঠিল, এবং আপন মনে কহিল, "দেখা যাক্, এ তেজ ভাংতে পারি কি না! সাধে কি আর বলে—'হলুদ জব্দ শিলে আর বৌ জব্দ কীলে', আমার কাছে রূপ যৌবনের মটমটানি খাটবে না চাঁদ।"

* * * *

বাড়ীতে পূজা। মহাসমারোহে চৌধুরীদের বাড়ী বহুদিন হইতে পূজা হইয়া আসিতেছে। পুরাতন দেওয়ান হরিশঙ্কর বাবু স্বর্গীয় প্রভুর সম্মান গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। সন্তোষের উচ্ছৃঙ্খলতায় তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইলেও প্রতীকারের তিনি কোনও উপায় পান নাই। এই পবিত্র মাতৃপূজার দিনে, সে স্বচ্ছন্দে বহির্ব্বাটীর সু-সজ্জিত কক্ষে বন্ধু বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রসিদ্ধা গায়িকা ও নর্ত্তকী মেহেরজানকে লইয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদে মত্ত রহিয়াছে। সুরার স্রোত অবাধে বহিতেছে।

সঙ্গিগণের উচ্চ হাস্যধ্বনি ও মাঝে মাঝে ভীষণ হাততালির শব্দে গায়িকার মধুর কণ্ঠস্বর ডুবিয়া যাইতেছে। বহুক্ষণ নৃত্য গীতের পর শ্রান্তা মেহেরজান মখমলের তাকিয়া হেলান দিয়া রূপার ফরাসীতে তামাকু সেবন করিতে লাগিল। সুরসিক কোনও ব্যক্তি রুমালের দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। কেহ বা খানিকটা এসেন্স মেহের-জানের গায়ে ঢালিয়া দিয়া তাহার চিত্তবিনোদনে প্রয়াস পাইল।

সন্তোষ কহিল, "বিবিজান, তুমি চুপ করে থাকলে এ ঘরে যে টেঁকা দায় হয়। তুমি মধুরকণ্ঠে আবার গান ধর, প্রাণটা জুড়িয়ে যাক, নইলে যে সব মজা মাটী হয়।"

ঈষৎ হাসিয়া, কটাক্ষ হানিয়া, অভিমানের সুরে মেহেরজান কহিল, "বাবুজী, আপনি বড় মহৎ লোক, আপনার মত দিলদরিয়া লোক খুব কমই এই কলিকাতা সহরে আছে, আপনি আমায় বড় মেহেরবাণী করেন, সেই জন্যে আপনার কাছে আমার নালিস আছে। যদি অনুমতি করেন, নিবেদন করি।" বাইজী স্বহস্তে বোতল হইতে সুরা ঢালিয়া, গ্লাসটি সন্তোষের মুখের নিকট ধরিল। সন্তোষ এক নিশ্বাসে পান করিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই শুন্‌বো, কি তোমার নালিস বিবিজান ?"

"আপনি আবার বিবাহ করেছেন, স্ত্রীটি শুনছি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী, তা আপনার হাত ঝাড়লে, আমরা

কৃতার্থ হয়ে যাই, আমার পাওনা বকসীস বাকী আছে, এই পূজার সময় সেটা শোধ করে ফেলুন।”

সন্তোষের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার তহবিল যে কপর্দ্দক-শূন্য, ঋণে সে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং কিরূপে সে এখন চারুহাসিনী, বরাঙ্গিনী বাইজীর মান রাখিবে? বিশেষ মেহেরজানকে কিছু অল্প মূল্যের কোন জিনিষ দেওয়া যাইতে পারে না, এবং সেটা সন্তোষেরও পদোচিত হইবে না পরে দিব বলিলে বন্ধু-সমাজে উপহাস-ভাজন হইতে হইবে। অতএব কি করা যায়, সন্তোষ ইহাই ভাবিতে লাগিল।

সন্তোষকে নিরুত্তর দেখিয়া, বাইজী মৃদু হাসিয়া, মধুর-স্বরে আবার কহিল, “সন্তোষ বাবু কি ভড়কে গেলেন? ভয় পান তো আমি অভয় দিচ্ছি, আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার কাছে কতবার পেয়েছি বলেই চাইছি। আপনার মত সদাশয় লোকের কাছে চাইব না তো আর কার কাছে চাইব? তা আপনার যদি এখন কোনও অসুবিধা থাকে, তা হলে আমি চাই না।”

পূর্ব্বেকার যাচ্ঞা অপেক্ষা, মেহেরজানের এই অভিমানমিশ্রিত কথাগুলিতে সন্তোষ অধিকতর বিচলিত হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “না না, দিতে আর অসুবিধা বা আপত্তি কি, তবে তুমি কি চাও সে-টা জানতে পারলে—”

ইত্যবসরে বাহির হইতে দরোয়ান হাঁকিল, "হুজুর, বৌ রাণী মাইকো গহনা লেকে গিরীশ আয়া হ্যায়।"

সন্তোষকে উঠিতে দেখিয়া, একজন বন্ধু কহিল, "নিজে যাবার দরকার কি? সেকরাকে ডেকে পাঠাও না?"

"দরোয়ান, গিরীশকে এইখানে পাঠিয়ে দাও।"

গিরীশ স্বর্ণকার বহুবৎসর হইতে এ বাড়ীর গহনাদি গড়িয়া আসিতেছে। সন্তোষের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কিছুদিন পূর্বে অন্নপূর্ণা নিজেরই হার ভাঙিয়া নব বধূর জন্য, নূতন ধরণের নেকলেস গড়িতে দিয়াছিলেন। গিরীশ তাহা লইয়া আজ আসিয়াছে। সন্তোষকে নর্ত্তকী ও পারিষদবেষ্টিত দেখিয়া গিরীশ কহিল, "আমি বাড়ীর ভিতরেই যাচ্ছি, মাঠাকরুণকে দেখাব।"

কয়েকজন অমনি বলিয়া উঠিল, "কি জিনিষ কবার আমরা কি দেখে চক্ষু সার্থক করতে পারি না? দেখাও না বাবা।" গিরীশ বাধ্য হইয়া, বাক্সটি খুলিয়া ধরিল। হীরক-লকেট সংযুক্ত, মুক্তাখচিত উজ্জ্বল স্বর্ণহার ঝক ঝক করিয়া উঠিল। সকলেই গিরীশের নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। মেহেরজান লুব্ধ নয়নে হারছড়াটির দিকে চাহিয়া কহিল, "সন্তোষ বাবু, এ হার পরলে বৌ রাণীর সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বাড়বে;—নয় কি?"

সন্তোষ সে উপহাসের মর্ম্ম বুঝিয়া কহিল, "গিরীশ, তুমি যাও, হার আমি মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বে গিরীশ সন্তোষের হাতে গহনা দিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেল।

একজন কহিল, "সন্তোষবাবু, বাইজীর গলায় একবার পরিয়ে দেখুন না, বাহারটা কেমন খোলে। তা থেকে আপনি মিসেস চৌধুরীর সৌন্দর্য্যটাও আইডিয়া করে নিতে পারবেন। পরালে তো আর ক্ষয়ে যাবে না, বাইজীও কেড়ে নেবেন না।"

সন্তোষ বিনা আপত্তিতে স্বর্ণহার সুপ্রসন্না বাইজীর কণ্ঠে পরাইয়া দিল, বাইজী হাস্যমুখে পুনরায় স্বহস্তে সুরা ঢালিয়া সন্তোষের হাতে দিয়া কহিল, "আপনার কি খোলা প্রাণ, কি খোস মেজাজ, অনেক বড়লোক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত কারও হাত দরাজ দেখি নি।"

সন্তোষ পানপাত্র গলাধঃকরণ করিয়া কহিল, "বা মেহেরজান, বেশ মানিয়েছে, ঠিক যেন পরীস্থানের নীল-পরী উড়ে এসে বসেছে। তবে এই হারই তোমার বক্‌সীস হোলো, এখন নালিস মিটল তো?"

চারিদিকে চটাচট হাততালির ধূম পড়িয়া গেল, "ব্রেভো সন্তোষ বাবু" বলিয়া কেহ কেহ রাসভ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বাইজী নমস্কার করিয়া জোড়হাতে সন্তোষকে কহিল, "আমাকে আপনার দাসী বলে মনে রাখবেন। আপনার দান আমি মাথা পেতে নিয়ে ধন্য হলুম। আপনি বৌ-রাণীকে

আবার দু'একদিনের মধ্যে নতুন হার গড়িয়ে দেবেন। তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন। তাঁরই জন্যে এ হার পেলুম—আপনার দয়াকে শত ধন্যবাদ।"

স্বর্ণহার ছড়াটির মূল্য হাজার টাকার কম হইবে না।

৫

শারদীয়া পূজার কয়েক দিন পরে, সন্তোষের প্রথমা স্ত্রীর পিতা, বৃদ্ধ এ্যাটর্ণী অমরনাথ জামাতার বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্তোষ পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিলে কখনই দেখা করিত না, কিন্তু সে তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল। শ্বশুরকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। অমরনাথ একখানি চেয়ার নিজেই টানিয়া লইয়া বসিয়া জামাতার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "সন্তোষ, শয়তানীবুদ্ধির সাধ এখনও মেটেনি? আবার একটি বালিকার সর্ব্বনাশ করতে বসেচ? হায়, হায়! আগে যদি একটু জানতে পারতুম, তা হলে সে রত্নহার কি তোমার মত বানরের গলায় পড়তো?"

সন্তোষ রাগিয়া কহিল, "সে সব কথায় আপনার কি অধিকার? আমি যদি দু'টো ছেড়ে পাঁচটা বিয়ে করি? আপনি কি তার ভরণ-পোষণ করবেন?"

"বটে? তা প্রথম স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য কি মাসহারা ব্যবস্থা করেচ? তাকে যে ত্যাগ করলে, সেজন্য

আমার এতটুকু দুঃখ নেই। তোমার মত পাষণ্ডের হাতে অপঘাত মৃত্যু হ'তে সে যে বাঁচলো, এই যথেষ্ট; কিন্তু তার খোরাক-পোষাকের জন্য তুমি কি দিচ্ছ তাই শুনতে চাই!"

"এক পয়সাও না! যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়, স্বামীর উপর প্রভুত্ব করতে চায়, সে কি স্ত্রী নামের যোগ্য? তারা হিন্দুগৃহের কলঙ্কস্বরূপ। অমন স্ত্রী পরিত্যজ্যা বলেই তো ত্যাগ করেছি। সে আবার মাসহারার দাবী করে কোন্ মুখে?"

অমরনাথ, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। টেবিলের উপর এমন সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, ফুলদানগুলা কাঁপিয়া উঠিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। তিনি বজ্র-কণ্ঠে কহিলেন "এতদূর স্পর্দ্ধা! নির্লজ্জ তোমার মত দুশ্চরিত্র, সতী-নারীর মর্ম্ম কি বুঝবে! বাছার সর্ব্বাঙ্গে যে কালশিরা পড়ে আছে, তা দেখলে চোখ ফেটে জল নয়—রক্ত বার হ'তে চায়! বেশ, বৃদ্ধ বয়সে এখনো অমরনাথের শরীরে কত শক্তি আছে, তোমায় তা দেখাবো। তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়, তবু একবার এসে তোমার যা মত-লব তা জানলুম, এর পর আমার কর্ত্তব্য আমি করবো। তোমার মত স্ত্রীহত্যা-প্রয়াসীর বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়াতে আমি কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করবো না।"

সন্তোষ, শ্বশুরের উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী অমরনাথের উচ্চকণ্ঠ শুনিতে পাইয়া

আসিতেছিল। সন্তোষ তাহাকে কহিল, "দিদি, বুড়ো বড় রেগেচে। তুমি একবার যাও। বড় বৌর জন্যে মাসহারা চায়। আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলুম দেবো না, কিন্তু বুড়ো না আদায় করে ছাড়বে না।"

হিরণ্ময়ী বাহিরের গৃহে আসিয়া অমরনাথকে প্রণাম করিল। অমরনাথ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "মা লক্ষ্মী, কবে এলে? তুমি যে এখানে আছ, তা জানতুম না।"

হিরণ্ময়ী কহিল, "আমি প্রায় চার মাস এখানে আছি। সন্তোষের জন্য আমায় থাকতে হয়েচে। সে যে রকম অধঃপাতে যাচ্ছে, তাতে আমাদের কারও প্রাণে সুখ-শান্তি নেই। বাপ-পিতামহের নাম তো ডোবালে। দেনা অনেক করেচে, বিষয় কতক বিক্রী না করলে শোধবার উপায় নেই। আপনার কাছে আমাদের মুখ দেখাতে লজ্জা করে,—অমন স্বর্ণপ্রতিমাকে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করলে। মায়ের ইচ্ছে, বড় বৌকেও আবার আনেন, তবে—"

অমরনাথ বাধা দিয়া কহিলেন, "তাকে আর এ ঘরে আসতে হবে না। আমি জানবো আমার কন্যা বিধবা হয়েচে। তোমার শুনতে রূঢ় লাগচে মা, কিন্তু কি করবো, বাছা যে পাশব অত্যাচার সহ্য করেছে! আহা, আমরা যে সে ননীর গায় কখনও একবার হাত তুলিনি! এখনও মার আমার পিঠের কালশিরা গুলো মেলায় নি।"

হিরণ্ময়ী কহিল, "সন্তোষ মাকে একটুও ভয় করে না।

আমায় যা একটু মেনে চলে, কিন্তু সে বোধ হয় নতুন নতুন, কি করে যে শোধরাবে”—হিরণ্ময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

অমরনাথ কহিলেন, “কি মহৎ বংশের সন্তান, আর কি লোকের ছেলে কি হয়ে গেল। লেখাপড়া শিখেও যে মানুষ এতটা অধঃপাতে যায়, তা আমার জানা ছিল না।”

হিরণ্ময়ী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “যা অদৃষ্টে আছে তা অখণ্ডনীয়। বড় বৌর নামে আর এ বৌর নামে দু’খানা তালুক শীগ্‌গিরই লেখাপড়া বন্দোবস্ত হবে, নইলে ও তো সব খুইয়ে কুলবধূদের পথে বসাবে বইতো নয়। বড়বৌকে একবার দেখতে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে যাব ?”

অমরনাথ কহিলেন, “বেশ তো, একদিন যেয়ো। মনোরমাকেও নিয়ে যেয়ো, সুশীলার সঙ্গে তার আলাপ আছে, দেখা হ’লে চিনতে পারবে ; কিছুদিন এক স্কুলে পড়েছিল। রমাকান্ত বাবুকে আমি চিনি, অতি সৎলোক, তাঁরও অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ! সকলি কর্ম্মফল, এই বলে মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র।”

৬

দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষে, পালঙ্কের উপরে একটি যুবতী বসিয়া ক্রোড়স্থ শিশুকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

শিশু ঘুমাইয়া মূল্যবান্ সময়টুকু নষ্ট করিতে নিতান্তই নারাজ। বিশেষ অদূরে তাহার সইমা ছবি আঁকিতেছে। তাহার কাছে রঙের বাক্স ও তুলি প্রভৃতি লোভনীয় দ্রব্য-গুলি লইয়া সে এতক্ষণ কাড়াকাড়ি করিতেছিল। মা আসিয়াই কিন্তু তাহাকে টানিয়া লইয়া কোলে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। শিশু হাত পা ছুড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। মা "আয়, আয়, ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আয়", প্রভৃতি ছড়া কাটিয়া নিদ্রাদেবীর আহ্বান-গীতি গাহিতেছেন, ক্রমে ক্রমে শিশুর চক্ষু দু'টি মুদিত হইল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। সুশীলা ছবি আঁকা ছাড়িয়া আসিয়া কহিল, "সই, খোকা ঘুমুলো? আহা কি সুন্দর দেখাচ্চে? নিদ্রারই যেন প্রতিমূর্ত্তি, আহা, গালে একটা চুমো দিই।" অতি সন্তর্পণে সুশীলা সুপ্ত শিশুর গালে চুম্বন করিল।

শিশুর মা কমলা শিশুকে বিছানায় শোয়াইয়া কহিল, "এখন খানিক ঘুমলেই নিশ্চিন্ত, যে দুরন্ত হয়েচে। বোস্ সই, দু'টো কথা কয়ে বাঁচি।"

সুশীলা বসিলে কমলা কহিল, "দু' বচ্ছর পরে দেখা, কিন্তু সই বলবো কি, আমার বুকটা তোর দুঃখে ফেটে যাচ্চে কি শ্রী ছিল কি হয়েচে। তোর মতন নারীর এমন দুর্ভাগ্য হোল, বিধাতার কি বিচার ভাই!"

"ও কথা বলতে নেই। কিসের দুঃখ বোন্? এত দিন

আমারও ঐরকম মনে হোতো, কিন্তু এখন আর কোন দুঃখ নেই, এখন বেশ আছি। সে কথা যাক্, এখানে ক'দিন থাকবি ?"

"বোধ হয় বেশী দিন নয়, কিন্তু কি যে বলিস্, নারীজন্ম যদি স্বামি-সেবাতেই বঞ্চিত হোল, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে ? আচ্ছা সই, তুই তো এত বুদ্ধিমতী, তবে একটা পুরুষকে বশে আনতে পারলি নি ? এও তো বড় লজ্জার কথা ! এত রূপ, এত গুণ তোর, এ রূপে গুণে স্বামীর মনকে বাঁধতে পারিস্ নি ? আমার বোধ হয়, তুই বড় অভিমানিনী, সেই মানের আগুনেই সব খুইয়েছিস্।"

মৃদু হাসিয়া সুশীলা কহিল, "তুই শুনে কি সব বুঝতে পারবি ? প্রথম প্রথম অভিমানভরেই থাকতুম। তার পরে দেখলুম, স্বামী তাতে আরও অধঃপাতে যাচ্চেন। তখন কখনও হাতে পায় ধরে বোঝাতুম, কখনও ঝগড় ঝাঁটিও করতুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু না। যা-তা বলে গাল দেন, আর বলেন, 'মেয়ে মানুষ বাঁদীর মতন থাক্‌বে, স্বামীর উপর কথা কইবে কি ? আমার যা খুসী করবো, সইতে না পার চলে যাও'—কত বুঝিয়েচি সই, কিন্তু সে বোঝবার নয়। তার পর মার-ধোর আরম্ভ করলে। অনেক সহ্য করেচি, মনে করেছিলুম, যদি সুমতি হয়। কিন্তু সই, ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ।" সুশীলা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

কমলা স্নেহার্দ্রস্বরে কহিল, "হায় হায়, এমন তো

কখনও শুনিনি। মূর্খ সে, তাই এমন রত্ন পেয়ে আদর কল্লে না। আচ্ছা সই, সে যে আবার বিয়ে করেচে, তার জন্যে কি তোর একটুও কষ্ট হয় না?"

"পাগলি আর কি, যে সমুদ্রে শয্যা পেতেচে, তার আবার শিশিরে ভয় কি? মনোরমা বড় ভাল মেয়ে, এক স্কুলে ছোট বেলায় পড়েছি। মেয়েটি যেন ছবির মত, তারও কপালের বিড়ম্বনা।"

"তা তার কপালে যদি সুখ থাকে, শোধরাতেও পারে।"

"আহা, তাই হোক্, সে সুখী হোক্, ভগবান তাই করুন।"

"আচ্ছা সই, সত্যি করে বল্ দেখি, সন্তোষের জন্যে মনটা কাঁদে কি না। ভালবাসা তো আর যাবার নয় বোন্, তাকে তো দেখতেও ইচ্ছে করে।"

ঈষৎ হাসিয়া সুশীলা কহিল, "যদি বলি করে না।"

"মিথ্যে কথা, আমি বিশ্বাস করি নে।"

"যদি তা সম্পূর্ণ সত্য হয়।"

"তা হলে সে কি হিন্দুর মেয়ের কথা? হিন্দুর মেয়ে, স্বামী যেমনই হোক্ তাকে ভালবাস্‌বেই, স্বামী তাকে ত্যাগ করলেও সে জনমে মরণে তারই দাসী হোয়ে থাকবে।"

"সই, স্বামীর অগাধ প্রেমের অধিকারিণী হোয়ে ঐ সব বক্তৃতা বেশ সহজে বোলে যাচ্চিস্, যদি একবার আমার মত অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতিস্, তো মনের গতি

অনুরূপ হোতো। পাপপুণ্য বুঝতে পারি নে। হৃদয়ের ধর্ম্ম বুঝতে পারচি বটে, যাকে একদিন জীবন পণ করে ভাল-বেসেছিলুম, এখন দেখছি আর তার প্রতি এতটুকু স্নেহ নেই, মন একেবারে বিরূপ হয়ে গেছে। যে এক দিন সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিল, সে সেই হৃদয়মন্দির হতে চিরনির্ব্বাসিত হোয়েচে। তুই আমায় অসতী ভাবছিস্, গাল দিচ্ছিস্, কিন্তু যা সত্যি তা অকপটে বলচি, যুক্তি-তর্ক নিয়ে ভালবাসা চলে না সই, হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মে মানুষ ভালবাসে।"

"বড় ভয়ানক কথা বল্‌ছিস্ সই, দেবতারে বিসর্জ্জন দিয়ে কি নিয়ে জীবন কাটাবি বোন্? তাঁরই স্মৃতি নিয়েই তুই জীবনের অবশিষ্ট দিন বেশ কাটাতে পারতিস্। পরি-বর্ত্তনশীল ভালবাসার কি মূল্য আছে সই? সমস্ত হৃদয় দিয়ে যদি ভালবেসেছিলি, অত্যাচারের পীড়নে কি সে ভাল-বাসার বিকৃতি হওয়া সম্ভব? তবে ঠিক ভালবাসিস্ নি।"

"তোর যুক্তি তর্কে আমি পারবো না। জীবন কাটাতে হোলে তার স্মৃতি ভিন্ন আর উপায় নাই কেন? আমি বিশ্ব-দেবতাকে আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কোরে নেবো, জগৎ সংসারে কত কাজ আছে, সেই সব কাজে আপনার জীবনকে ঢেলে দেবো। এতেও কত আনন্দ আছে। রিক্ত হৃদয় কেমন পূর্ণ হোয়ে উঠবে, সকল ব্যর্থতা আমার সফল হবে।"

"ও সব বাজে কথা রেখে দে, মেয়ে মানুষের মুখে ও সব কথা সাজে না। পুরুষের অনেক কাজ অনেক লক্ষ্য

থাকতে পারে; কিন্তু নারীর একটি মাত্র কর্ত্তব্য, একটি মাত্র আশা, একটিমাত্র অবলম্বন। তা কি? না, স্বামীর প্রেম; তা হোতে বঞ্চিত হোলে, নারীজন্ম বৃথাই হোলো।"

"তোর সঙ্গে আমার মত মিলবে না। পুরুষকে ছেড়ে নারীর তা হোলে কোনো অস্তিত্বই নেই এই তোর কথা! আমি তা মানি নে। যা গিয়েচে, যা হারিয়েচে, তারই জন্যে বুকভরা হাহাকার, নয়নভরা অশ্রু নিয়ে এমন অমূল্য মানব-জীবন খুইয়ে ফেলবো? ভগবানের অবিচার ও অদৃষ্টের দোষ দিতে থাকবো? তাই বা কেন হবে? স্বামীর প্রেম অতি চমৎকার, অতি অমূল্য জিনিষ; কিন্তু খাঁটি সোণা ভাল বলে কেমিক্যালকে আদর কেউ করে কি?"

এমন সময়ে হিরণ্ময়ী ও মনোরমা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সুশীলা শশব্যস্তে উঠিয়া হিরণ্ময়ীকে প্রণাম করিল, এবং মনোরমার হাত ধরিয়া পর্য্যঙ্কে বসাইল। কমলাকে কহিল, "সই, ইনি আমার বড় ননদ।" কমলা উঠিয়া হিরণ্ময়ীকে প্রণাম করিল। সুশীলা সংক্ষেপে তাহার সই কমলার পরিচয় হিরণ্ময়ীকে বলিল। হিরণ্ময়ী কহিল, "বড়বৌ, তোর জন্যে বড় মন কেমন করতো, তাই একবার দেখতে এলুম। সে দিন তালুই মশাইকে বলেছিলুম।"

"বেশ করেছেন দিদিমণি, বাবা বলছিলেন, আপনি আসবেন।" মনোরমার হাত ধরিয়া কহিল, "মনোরমা, চিন্‌তে পারচ? কতটুকু ছিলে, কত বড়টি হয়েছ।"

মনোরমা হাসিল। সে বিস্মিত-নয়নে সুশীলাকে দেখিতেছিল। এমন সুগঠিত দেহ, এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, এমন নয়নভরা মাধুর্য্য, অধরভরা হাসি। এই নারী যাহাকে প্রণয়-বাঁধে বাঁধিতে পারে নাই, তাহার কি ক্ষমতা যে সে তাহাকে আকৃষ্ট করে? সুশীলাকে সে ছোট বেলায় দেখিয়াছিল, এখন সে আকৃতির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

হিরণ্ময়ী কহিল, "মাঐমা আসচেন, নীচে দেখা হোল। সকলের শরীর গতিক ভাল তো?"

"হাঁ দিদি, বাবার শরীর কিন্তু ভাল নয়।" এমন সময়ে সুশীলার মাতা পাণ লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। "মা লক্ষ্মীরা, পাণ খাও মা" বলিয়া সকলের হাতে পাণ দিয়া, তিনি বসিয়া সস্নেহে হিরণ্ময়ীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সুশীলা মনোরমাকে অন্যান্য গৃহগুলি দেখাইতে লইয়া গেল। হিরণ্ময়ী কহিল, "একখানা তালুক বড় বৌয়ের নামে লিখিয়ে এনেচি। এখনও রেজেষ্ট্রী হয় নি, তাই মশায়কে দেখাতে এনেচি। বড়ই দুঃখ যে আপনাদের সঙ্গে এমন হলো।"

"আমার অদৃষ্ট মা, অমন রূপে-গুণে ধনে-মানে জাজ্বল্যমান জামাই পেয়েছিলুম,—অদৃষ্টে সুখ নেই। যাক্ সে জন্যে আর আক্ষেপ করিনে। আমি তো ওঁকে বলেছিলুম যে, 'মেয়েকে পেটে ঠাঁই' দিয়েচি দু'মুঠো ভাতও জন্মকাল দিতে পারবো।' উনি বললেন, 'না, তাকেই দিতে হবে, তার

অত সম্পত্তি থাকতে আমি ছাড়বো কেন ?'—যাক্ মা এখন এ বৌকে ভালবাসচে তো ?"

"খামখেয়ালী, কুসংসর্গ ত্যাগ না করলে মতিগতি শোধরান দায়। মা বড় মনোকষ্টে আছেন। সুশীলা কি বড় মনমরা হোয়ে গেচে ?"

"প্রথম প্রথম খুবই ভেঙে পড়েছিল মেয়ের মুখেরদিকে চাইতে ভয় হোত। আজকাল বেশ ভাল আছে। আমার বড় ছেলের কাছে বেশ মন দিয়ে ছবি আঁকতে শিখচে। উনি নিজে ওকে নিয়ে রাত্রে পড়াতে বসেন। বেশ মন দিয়ে পড়াশুনাও করচে। মনে করবো, মেয়ের আমার বিয়ে হয় নি। মেয়ে পাঠিয়ে রাতদিন পথ তাকিয়ে থাকতুম। কখন কি হয় ভয়ে আড়ষ্ট থাকতে হোত। এ একটা হেস্ত নেস্ত হোয়ে গেছে, ভালই হয়েছে।"

হিরণ্ময়ী সুশীলার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল, এক্ষণে এসকল কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কমলা ভাবিতেছিল, "কি আশ্চর্য্য, এরা কি প্রকৃতির লোক ! মেয়ে রত্ন হারাইয়াছে, তাহাকে কাচের প্রলোভনে ভোলাইতে চাহিতেছে মাত্র ; অথবা এ ভিন্ন আর উপায় কি ?

৭

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি। তখন অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। দিনের বেলায় শীতের প্রভাব মোটেই বুঝা যায় না,

কিন্তু যমুনার ধারে, নিশি-প্রভাত সময়ে উহার অস্তিত্ব প্রবল রকমেই অনুভূত হয়। নিদ্রাভঙ্গে বাংলার খোলা বারান্দায় যখন মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই, সমস্ত পূর্ব্বাকাশ, দক্ষিণের সীমা পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শরৎ ঋতুর শেষে তখনও আকাশে স্তূপাকার মেঘের খেলা; সুতরাং নানা আকৃতির পুঞ্জীভূত মেঘমালার উপরে সেই নবকিরণ-ছটা কি বিচিত্র সৌন্দর্য্যের না সৃষ্টি করিয়াছে! সম্মুখে যমুনার তরঙ্গহীন নীল জলের মধ্যে সেই স্বর্ণাভা প্রতিভাত হইতেছে। দূরে রাজপথের দুই পার্শ্বে নিম্ববৃক্ষের সারি। তাহাদেরও উপরকার স্থানে স্থানে পত্রগুচ্ছে কাঁচা সোণার রং ধরিয়াছে। বাগানে দু'টি শিউলী ফুলের গাছ ফুল-ভারে ছাইয়া আছে। ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিবামাত্র, ঝর ঝর করিয়া শিথিল-বৃন্ত ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িয়া সুগন্ধময় সুন্দর শয্যা কাহার জন্য রচনা করিতেছে। মনোরমা জীবনে অনেক প্রভাত দেখিয়াছে, কিন্তু আজিকার তরুণ উষালোকের মত কোনও উষালোক তাহার হৃদয়কে এমন করিয়া স্পর্শ করে নাই, তাহার হৃদয়-বীণার তারে এমন করিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে জানিতে দ্যায় নাই যে সে একা—বড় একা, তাহার জীবন বড় নিঃসঙ্গ, বড় অসম্পূর্ণ। চারিদিক্-কার এই সুন্দর দৃশ্য যেমন তাহার চিত্তকে আনন্দ-রসে সিক্ত করিয়া তুলিল, তেমনি তখনি তাহার মনে পড়িয়া

গেল, হায়, এই বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য যদি আজ তারা দু'টি প্রাণীতে উপভোগ করিতে পারিত! কিন্তু সন্তোষ এখন কোথায়? সে তো ক্বচিৎ রাত্রে গৃহবাস করে মাত্র। বৎসরাধিক কাল মনোরমার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এই এক বৎসর কালই সুদীর্ঘ যুগের মত, কিশোরীর আনন্দপূর্ণ জীবনে কি পরিবর্ত্তনই না ঘটাইয়াছে!

যে মনোরমার বিশাল চক্ষু দু'টি সর্ব্বদা পুলকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল থাকিত, হাসির প্রভায় যে রাক্তম ওষ্ঠাধর দু'টি সর্ব্বদাই সুন্দর দেখাইত, সর্ব্বাঙ্গে যেন একটি নির্ম্মল আনন্দের আভাস লীলায়িত হইত, আজ সে একখানি মূর্ত্তি-মতী বিষাদ-প্রতিমা! তাহার সে উল্লাস নাই, সে চাঞ্চল্য নাই! ষোড়শবর্ষীয়া তরুণীর সর্ব্বাঙ্গে প্রৌঢ়ার গাম্ভীর্য্য প্রকাশমান!

সন্তোষ জননীকে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে। কলিকাতা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। হিরণ্ময়ীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া, বিষয়গুলির ও ঋণের একটা বিলি-বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। হিরণ্ময়ী কঠোরতা অবলম্বন করিয়া, ভ্রাতার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে দমন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। সন্তোষ কখনও এরূপভাবে নিজের বিলাস ব্যসন চরিতার্থতায় বাধা পায় নাই; সুতরাং এ পীড়ন তাহার অসহ্য বোধ হইল। অথচ নগেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীকে সে ভয় করিয়া চলে। বহির্ব্বাটীতে বন্ধুবান্ধব লইয়া অখণ্ড

আমোদ আহ্লাদেও সে বঞ্চিত হইয়াছিল। ইচ্ছামত ঋণ করিয়া খরচ করিবার পথেও বাধা পড়িল। কোনও রাত্রি বাহিরে যাপন করিলে হিরণ্ময়ী ও নগেন বাবুর নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। এ বিড়ম্বনায় তাহার ক্ষোভের সীমা ছিল না। সে তখন মাতাকে ধরিয়া বসিল, "মা, চল, তোমায় কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণ করাইয়া আনি।" পূর্ব্বে অর্থের অসদ্ভাব না থাকিলেও অন্নপূর্ণা কখনও তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং পুত্রের এই প্রস্তাবে তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। দেশ বিদেশ দর্শনে, দেবদেবী পূজায় তাঁহার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি পাইবেন, অনেক পাপ তাপ নষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ীও মনে করিল, কিছু দিন কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিলে সন্তোষেরও মতিগতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সুতরাং অবিলম্বে যাত্রার উদ্যোগ হইল। মনোরমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল, কিন্তু মনোরমা চিরকাল কলিকাতার সঙ্কীর্ণ বাটীতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশসমূহের অভিনব দৃশ্যাবলী, নানাস্থানের প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়ী অপরূপ সৌন্দর্য্য তাহার মানসচক্ষে এক রহস্যময় কল্পনাকে সাজাইয়া বসিয়াছিল। আজ সহসা সে কল্পনাকে সার্থক করিবার সুযোগ সে ত্যাগ করিবে কেন? সে হিরণ্ময়ীকে কহিল, "দিদিমণি, আমি তার সঙ্গে যাব, আপনি অনুগ্রহ কোরে মত করুন।" সন্তোষের সঙ্গে মনোরমাকে পাঠানো

ভালই মনে করিয়া হিরণ্ময়ী সম্মত হইল। কিন্তু সে ভ্রাতৃ-জায়ার অঙ্গ হইতে মূল্যবান্ গহনাগুলি খুলিয়া নিজের কাছে রাখিল। একজন মাত্র বিশ্বাসী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া সন্তোষ, মাতা ও পত্নী সমভিব্যাহারে প্রথমে গয়ায় আসিল। সেখানে দিন কয়েক থাকিয়া তাহারা কাশীতে উপস্থিত হইল। কাশীর মহাসমারোহে সকলকার চিত্তকে এত অধিক আকৃষ্ট করিল যে, দুই মাস সে স্থানে থাকিয়াও কেহ সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। প্রাতে গঙ্গাস্নান ও অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর দর্শন, সন্ধ্যায় জাহ্নবী তীরে পবিত্র-হৃদয়ে সন্ধ্যাবন্দনা ও দেবমন্দিরে আরতি পূজায় অন্নপূর্ণার অন্তর ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তিনি ভাবিতেন, সংসারে আর ফিরিয়া সুখ কি? জীবনের অবশিষ্ট দিন কটা যদি এখানে দেবতার চরণতলে কাটাইতে পাই? আর সন্তোষ? কাশীতে তাহার ন্যায় ধনী, বিলাসী যুবকের যোগ্য সহচর মিলিতে অধিক বিলম্ব হইল না, সেও বেশ মনের আনন্দে দিনযাপন করিতেছিল।

মনোরমা কলিকাতার বিশাল প্রাসাদের একটি কক্ষে নিজের বিষাদপূর্ণ হৃদয় লইয়া সর্ব্বদা গুমরিয়া মরিত। তাহার সমবয়স্কা তেমন সঙ্গিনীও সেখানে ছিল না। এখানে তাহার পিঞ্জরাবদ্ধ অন্তঃকরণ যেন মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু হায়! আজ আবার সে নিজেকে যেমন করিয়া নিঃসঙ্গ অনুভব করিল, পূর্ব্বে কখনও তাহা করে

নাই। যে পাইয়া বঞ্চিত হয়, সে জগতে বড় অভাগা সন্দেহ নাই। মনোরমা স্বামীর ভালবাসা কখনও পায় নাই, পাইবার জন্য বড় আকুলও হয় নাই, কিন্তু তবু আজ যেন তাহার মনে হইল, সে বড় দুর্ভাগিনী, তাহার নারীজন্ম বৃথা।

কাশীতে সন্তোষ পুনরায় পূর্ব্বেকার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল দেখিয়া অন্নপূর্ণা কাশী পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে আসিলেন। কিন্তু যে দুষ্ক্রিয়াসক্ত, তাহাকে আটকাইয়া রাখা যায় কতক্ষণ? সন্তোষ এলাহাবাদেও ইচ্ছামত চলিতে লাগিল। মনোরমা সে দিন যমুনার নীল জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল, আমার জীবন তো একটি বোঝা মাত্র, সাধ করিয়া এ বোঝা বহিয়া মরি কেন? আমার কোনও আশা নাই, কোনও আনন্দ নাই, কোনও সাধ নাই। পৃথিবী থেকে আমার বাসা যত শীঘ্র উঠে, ততই ভাল। ঐ তো সম্মুখে শান্ত সলিলা যমুনা, ওর বুকে এক লহমার মধ্যে আমার তো এ পোড়া জীবনের বোঝা নামাইয়া দিলে হয়। কিন্তু মৃত্যু-চিন্তায় তাহার সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া উঠিল; স্নেহময় জনকজননীর মুখচ্ছবি স্মরণ হইল। আবার তাহার মনে হইল, এই নবীন যৌবন, এই দেহভরা অনুপম সৌন্দর্য্য, প্রাণভরা কত অতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সবই এমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে মৃত্যুর নিষ্ঠুর কবলে অর্পণ করিব কেন? আরও কিছু দিন অপেক্ষা করি

না কেন? কিন্তু কিসের অপেক্ষা? দুশ্চরিত্র স্বামী যদি কালে সংশোধিত হয়, যদি সে ভবিষ্যতে দুষ্ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাহার গৃহলক্ষ্মীর পানে ফিরিয়া চায়, এই আশায় জীবন যাপন করি না কেন? হিন্দু নারীর ইহা অপেক্ষা মহত্তর আদর্শ ও ব্রত কোথায়? কিন্তু হায়, মনোরমার হৃদয় যে বিদ্রোহী হইতে চায়। সে যে বলিতেছে, না, না, ও প্রলোভন আমায় দেখাইও না, দয়া করিয়া সময় মত ভালবাসিবে, কৃপা করিয়া কোনও দিন ফিরিয়া চাহিবে, সে ভালবাসা আমি চাই না। যে আমার মনের মত নয়, তাহাকে আমি ভালবাসিতে পারিব না, তাহার ভালবাসা আমার প্রার্থনীয়ও নয়।

মনোরমা নিজের মনের ভাব স্মরণ করিয়া, নিজেই লজ্জিত হইয়া, যুক্তকরে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল, "ঠাকুর আমায় মার্জ্জনা করো, মার্জ্জনা করো। স্বামীকে দেবতা মনে করে তাঁর সব ত্রুটি ভুলে যেতে চাই; কিন্তু আমার বিদ্রোহী হৃদয়কে যে কিছুতেই মানাতে পারছি নে প্রভু!"

৮

কিছু দিন এলাহাবাদে থাকিবার পর সন্তোষ মাতা ও পত্নীকে লইয়া জব্বলপুরে আসিল। এখানে একটি বাগান-সহিত সুন্দর বাংলো ভাড়া লইল। এক দিন সকলে

মিলিয়া নর্ম্মদা-প্রপাত দেখিতে গেল। সে সুন্দর দৃশ্য দর্শনে মনোরমার বড় আনন্দ হইল। নূতন দেশের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া সে নিজের মনঃকষ্ট অনেক সময় ভুলিয়া যাইত। আর সন্তোষ? এখানেও তার মনের মতন দু'চারি জন সঙ্গী জুটিল।

প্রথম প্রথম সে মনোরমাকে একটু ভালবাসার চক্ষে দেখিত, কিন্তু সেটাকে ঠিক ভালবাসা বলা যায় না, রূপের নেশা মাত্র। দিনের পর দিন যেমন সে নেশার ঘোর কাটিয়া আসিতে লাগিল, মনোরমার প্রতি তাহার আর সে অনুরাগ রহিল না। সমস্ত দিন, এবং অধিকাংশ রাত্রি পর্য্যন্ত সে বাহিরে কাটাইতে লাগিল। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। পুত্র তো তাঁহার নিষেধ মানিয়া চলিবেই না, বধূকে তিনি কত রকমে বুঝাইলেন, "মা একটু বুঝে শুনে চল, তোমারি মন্দ, তোমারি ক্ষেতি হবে, একটু হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে রাতটুকু যাতে ঘরে থাকে তার চেষ্টা কর।" মনোরমা কিন্তু তাহা পারিল না, বরং স্বামী নিকটে না আসিলে সে যেন আরাম বোধ করিত। সন্তোষের সহিত কথা কহিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। সন্তোষের চরিত্র—তাহার মনে সন্তোষের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা জন্মিবার মোটেই অবসর দ্যায় নাই। প্রথম হইতেই মনোরমা স্বামীকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। হিন্দু পরিবারের মধ্যে মেয়েদের

শৈশব হইতেই সংস্কার হয়, স্বামী যেমনই হউন, স্ত্রীর চক্ষে তিনি দেবতা। মনোরমার পিতার শিক্ষা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। তিনি বলিতেন, পুরুষ যেমন রমণীর চরিত্রের সাধুতা ও পবিত্রতার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিবে, নারীও সেইভাবে পুরুষের চরিত্র-বিচার না করিয়া চলিবে কেন? উভয়েই সংসার বা সমাজের পবিত্রতা সমভাবে রাখিয়া চলিতে বাধ্য। তিনি নিজে অত্যন্ত সাধুস্বভাব, তেজস্বী ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক। সেই জন্যই মনোরমা পিতার ন্যায় লোকের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। সুরাপায়ীদিগকে পিতার ন্যায় সে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। আর আজ অদৃষ্ট-দোষে সে এমনি একজন মদ্যপেরই সহধর্ম্মিণী হইয়াছে।

সহধর্ম্মিণী! মনোরমার হাসি আসিত। প্রাণ যাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ, তাহার সহধর্ম্মিণী কেমন করিয়া হওয়া সম্ভব? সমাজ বলিবে, বিবাহের মন্ত্রবলে। কিন্তু ওগো, তা হয় কই? যদি না হয়, সে নারী পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে পতিতা, সতীকুলশিরোমণি হিন্দুললনার তালিকা হইতে বিচ্যুতা। তাই যদি হয়, তবে তো মনোরমা মহা পাপীয়সী! কিন্তু সে যে হৃদয়ের সহিত যথাশক্তি সংগ্রাম করিত, বিদ্রোহী হৃদয়কে সে মানাইতে চেষ্টা করিত। দেবতার ত্রুটি বা দোষ লক্ষ্য করা সেবিকার পক্ষে মহা অপরাধ তার শাস্তি অনন্ত নরক-যাতনা; কিন্তু অবাধ্য

হৃদয় সে শাসনবিধি মানিতে চায় কই? স্বামীর সহিত সে মোটেই বাদানুবাদ করিত না। সন্তোষ যাহা কিছু করিতে বলিত, নীরবে তাহা সম্পাদন করিত। সেজন্য সন্তোষও মনোরমাকে প্রথমা পত্নীর ন্যায় গালাগালি বা প্রহার করিত না।

জব্বলপুরে মনোরমার একটি সঙ্গিনী জুটিল, মনোরমাদের বাগানের পার্শ্বেই তাহার বাসাবাটী। মেয়েটির নাম কামিনী, সে মনোরমারই সমবয়স্কা। ক্রোড়ে একটি নধরকায় দেড়বৎসরের শিশু। কামিনীর স্বামী জাতিতে স্বর্ণকার, নিজের একখানি দোকান আছে। মনোরমার সহিত কামিনীর আলাপ শীঘ্রই সখীত্বে ও ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। মনোরমা সঙ্গিনী পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবস্থা-বিশেষে মনোরমার সহিত কামিনীর কতখানি প্রভেদ। মনোরমা লক্ষপতির গৃহের বধূ, কামিনী দরিদ্র স্বর্ণকার-পত্নী, রূপগৌরববিহীনা। কিন্তু দুইখানি তরুণ হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া পড়িল! এই জন্যই কি কবি বলিয়াছেন, "বয়সের সঙ্গে কি মনের মিল?" কামিনী প্রত্যহ কার্য্যাবকাশে শিশুটিকে লইয়া, মনোরমার কাছে আসিয়া বসিত। দুইজনে কত গল্প-গুজব হইত। মনোরমা কত বই পড়িয়া কামিনীকে শুনাইত। সেলাই, বোনা সে বহুদিন ফেলিয়া রাখিয়াছিল, এখন আবার

কামিনীর খোকার জন্য ফ্রক সেলাই করিতে নূতন করিয়া মন দিল। কামিনীও মোজা বোনা শিখিতে লাগিয়া গেল। মনোরমা সুগন্ধি তৈল দিয়া কামিনীর চুল বাঁধিয়া দিত। কামিনীর আপত্তি সত্ত্বেও নিজের রেশমি ফিতা দিয়া খোপা বাঁধিয়া দিতে ছাড়িত না, খোকার মাথা আঁচড়াইয়া পরিপাটি করিয়া সিঁথি কাটিয়া দিত। শ্বেত-প্রস্তরের ও কাশীর খেলনা কিনিয়া বাক্স বোঝাই করিয়া ছিল; এখন সেগুলির একটি একটি প্রত্যহ খোকাকে আনন্দের সহিত উপহার দিত।

খোকার পিতার বাড়ীতে আসিবার সময় হইলে কামিনী শশব্যস্তে খোকাকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইত। মনোরমা বলিত, "খোকাকে রেখে যাও না ভাই, ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।" কামিনী হাসিয়া বলিত, "না বৌরাণী, উনি বাড়ী এসে খোকাকে না দেখলে অস্থির হন। ঘুমিয়ে থাকলে ঘুমন্ত ছেলেকে চুমু খান, আর বারবার বলেন, "কতক্ষণে উঠবে, আমি বাড়ী এলাম আর এখন ওর ঘুমোবার সময় হল!"

মনোরমা হাসিয়া কহিত, "তবে খোকাকে ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই, তুমি থাক, একটু পরে যেও।"

কামিনী তাড়াতাড়ি কহিত, "বৌরাণী কি পাগল? আমায় না দেখলে তিনি রাগ করবেন যে! তাঁকে খেতে দেব। রোজই তো আমি আসচি দিদি।"

কামিনী চলিয়া গেলে মনোরমা কত কি ভাবিত। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া সে কামিনীর সৌভাগ্যকে হিংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী না হইয়া কোন সচ্চরিত্র দরিদ্র পুরুষের গৃহিণী হইত, যদি স্বামীর প্রাণপূর্ণ নির্ম্মল প্রণয় লাভ করিত, তাহা হইলে তাহার নারীজন্ম সার্থক হইত। সে যদি কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাগত ক্লান্ত স্বামীর বিশ্রাম ও সেবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতে পারিত, আর কখনও বা অন্তরালে থাকিয়া স্বামীর অনুসন্ধিৎসু ব্যাকুল আঁখির অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিতে পাইত, স্বামীর সোহাগ-পূর্ণ প্রীতিবাক্যে যদি তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইত, তাহা হইলে পর্ণকুটীরে বাসও তাহার কত আনন্দের ছিল। যদি সে একটি হাস্য-বিকসিতমুখ কচি শিশুকে লইয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত, পিতাকে দেখিয়া জননীর ক্রোড় হইতে শিশু পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িত, তিনি শিশুকে স্নেহালিঙ্গনে বাঁধিয়া. অজস্র চুম্বনে সে সুকোমল গণ্ড দু'টি ভরিয়া দিতেন, হাসির লহর তুলিয়া শিশু উভয়ের হৃদয়ে সুধার ধারা ঢালিয়া দিত, প্রীতিবিস্ফারিত চক্ষে সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনোরমার হৃদয় পত্নীত্ব গর্ব্বে, মাতৃত্ব-গর্ব্বে ভরিয়া উঠিত, স্বীয় জীবনের সার্থকতার জন্য সে জীবনদাতাকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ধন্যবাদ দিত। হায় রে কল্পনা! মনোরমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত, শুষ্ক-বেদনায়

তাহার বক্ষঃস্থল নিষ্পেষিত হইতে থাকিত। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে মনে মনে কহিত, "ভগবন্, কোন্, পাপে আমার সারা জীবন ব্যর্থ করে দিলে প্রভু!"

মনোরমা এক একবার ভাবিত, সন্তোষের হাতে পায়ে ধরিয়া সে তাহাকে কুপথ হইতে ফিরিতে বলিবে; কিন্তু সপত্নীর কথাও সে শুনিয়াছে। সে অভাগিনী তো অনেক চেষ্টা করিয়াছে। সন্তোষ মাঝে মাঝে বলে, "মেয়েমানুষ, খাও দাও, দু'খানা গয়না পর, ঘরে বসে আমোদ আহ্লাদ কর, পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাতে যেয়ো না, তুমি চুপ-চাপ আছ, এ বেশ ভাল। সেটা ভারী ডেঁপো ছিল, তাই মেরে তাড়িয়েছি। তবে তোমার যেন কিছু স্ফূর্ত্তি দেখতে পাইনে, প্রাণটা এ বয়সে এত নীরস কেন?" এই সকল কথা স্মরণ করিয়া মনোরমা আর স্বামীর মতি-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিত না, বিশেষ আরক্তলোচন, স্খলিতচরণ জড়িতবচন স্বামীকে শয্যাগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলে, তাহার অন্তঃকরণ ঘৃণায় ও ধিক্কারে যুগপৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

৯

মনোরমা গৃহের মধ্যে বসিয়া নতমুখে একখানি পুস্তক পড়িতেছে, সহসা গৃহমধ্যে একজন সুবেশ সুদর্শন যুবককে সঙ্গে লইয়া সন্তোষকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনোরমা

সচকিতে মাথার ঘোমটা টানিয়া গৃহের অন্য দ্বার দিয়া পলায়নের উপক্রম করিল। সন্তোষ দ্বার রোধ করিয়া কহিল, "মানুষ হয়ে, মানুষকে এত ভয়? বাঘও নয় সাপও না, উনি তোমারি মতন একজন মানুষ। ওগো, ও ভদ্রলোকটির পরিচয় পেলে এখুনি তোমার চোখে মুখে হাসি ঠিক্‌রে পড়বে, উনি আমার বন্ধু না—ভয় নেই, তোমার বন্ধু, তোমারি কাছে এসেছেন। বিনয় বাবুকে চেনো না? তোমার বাবার বন্ধুর ছেলে, ইনি এখানে মাষ্টারী করেন, মাকে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে দেখতে এসেছেন. তোমার বাবা আমায় চিঠি লিখে পরিচয়-পত্র দিয়েছেন, বিনয়বাবুর মা ওঘরে মার কাছে বসে আছেন, এঁকে আমি তোমার কাছে নিয়ে এলাম।"

মনোরমা আসিয়া বিনয়ের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। বিনয় স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল, "চিন্‌তে পারছ মনু? অনেক দিনের পর দেখা।"

মনোরমা কহিল, "বসুন দাদা, পিসিমা ভাল আছেন? আপনারা সব ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ—ভাল আছি বই কি, নইলে এলাম কি করে?" বলিয়া বিনয় চেয়ারে বসিয়া কহিল, "সন্তোষ বাবু, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।"

"না দাদা, আমার বাইরে যেতে হবে, মনোরমা, দেখো যেন আদর যত্নের ত্রুটি না হয়, ভাল করে খাইয়ো

দাইয়ো। বিনয়বাবু, কিছু মনে. করবেন না, আবার দেখা হবে।" সন্তোষ যেন আর কি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কথাটা কেমন আটকাইয়া গেল। শেষে ঐ ক'টা কথা বলিয়া মুখটি বিকৃত করিয়া চলিয়া গেল।

সন্তোষ চলিয়া গেলে, স্বামীর ভাব বুঝিতে পারিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় মনোরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, বিনয়ের অন্তরে যেন একটা ঘা পড়িল। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনয় কহিল, "তোমার চেহারার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে,—সাত বৎসর সময় তো বড় কম নয়।" বিনয়ের মানস-চক্ষে একটি তন্বঙ্গী বালিকার লীলাচঞ্চল মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল, বর্ত্তমান পূর্ণ-যৌবনশ্রী-উদ্ভাসিতা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার মধ্যে সেই বালিকাই মিশিয়া আছে ভাবিয়া তাহার যথেষ্ট আনন্দ হইল। যখন বিনয় স্কুলে পড়িত, পাশাপাশি বাড়ী থাকায়, দুই পরিবারে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিনয়ের মা মনোরমার পিতাকে ভাই সম্বোধন করিতেন। বিনয়ের পিতা জব্বলপুরে বদলী হওয়াতেই দুই পরিবারে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পত্রাদি দ্বারা বরাবর খবরাখবর চলিত। বিনয়ের পিতৃবিয়োগ হইবার পর, বিনয় অগত্যা কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়, এবং প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এখন সে এম-এ পড়িতেছে। মনোরমার মাতার মনে মনে ইচ্ছা ছিল, বিনয়ের সহিত মনোরমার বিবাহ দেন, কিন্তু তাহারা বড় দরিদ্র বলিয়া

সে বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন, এমন সুন্দরী মেয়ে, তাহার উপর দু'চার হাজার টাকা দিলে, বিনয়ের অপেক্ষাও রূপে গুণে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, জামাতার অভাব হইবে না। বিনয়ের মাতারও মনে সাধ হইত বালিকা মনোরমাকে বধূরূপে গ্রহণ করেন; তাঁহার কন্যা ছিল না, বধূকে কন্যারূপে পাইয়া সে সাধ পূর্ণ করেন। কিন্তু তিনি কখনও মুখ ফুটিয়া এ প্রস্তাব মনোরমার পিতা-মাতার নিকট করিতে পারেন নাই। স্বামীর বেতন মাত্রই তাঁহাদের ভরসা; এমন অবস্থায় মনোরমাকে বধূ করিবার বাসনা বৃথা। তবে যদি ভগবান্ দিন দেন, বিনয় মানুষ হয়, তাহা হইলে আলাদা কথা। তারপর জব্বলপুরে যখন তিনি হঠাৎ মনোরমার বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইলেন, তখন তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। কিন্তু মনোরমা লক্ষপতির গৃহের বধূ হইল, সুন্দর বিদ্বান্ পতি লাভ করিল শুনিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে নবদম্পতীর কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন।

মনোরমারা জব্বলপুরে আসিয়াছে বলিয়া মনোরমার মাতা, ক্ষীরোদাকে (বিনয়ের মাতা) উহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পত্র লিখিলেন। সন্তোষকেও সেই সঙ্গে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। বিনয় আজ রবিবারে ছুটির দিনে মাতাকে সঙ্গে লইয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

মনোরমা কহিল, "দাদা, আপনার চেহারাও অনেকটা বদ্‌লে গেছে, আপনি কি লম্বাই না হয়েছেন।"

হো হো করিয়া হাসিয়া বিনয় কহিল, "লম্বা হাতে তোমায় রোজ রোজ চাটুয্যেদের কুল গাছ থেকে কুল পেড়ে দিতুম, মনে আছে তো? তুমি আবার বল্‌তে, দাদার হাত আর একটু লম্বা হলে ঐ ডালটায় নাগাল পেতে। আমি বল্‌তুম, কিছুদিন পরে নাগাল পাব দেখিস। তা এখন তো লম্বা যথেষ্ট হয়েছি, দুঃখের বিষয়, তোমার আর গাছের কুল পাড়িয়ে খাবার লোভের বয়স নেই।"

মনোরমা হাসিল। সে প্রীতিপূর্ণ শৈশব-চিত্র তাহার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! আহা! সে স্মৃতি কত উজ্জ্বল, কত সুন্দর! সর্ব্বস্ব বিনিময়ে যদি আবার সেদিন ফিরিয়া পাওয়া যাইত!

এই সময় বিনয়ের মাতা গৃহের মধ্যে আসিলেন। মনোরমা পিসিমার পায়ের ধূলা লইল, ক্ষীরোদা মনোরমাকে বক্ষে চাপিয়া, চুম্বন করিয়া কহিলেন, "মনের সুখে থাক, মনে প্রাণে শান্তি লাভ কর, তার বাড়া জিনিষ দুনিয়ায় আর নেই।"

এই কয়টি কথায় মনোরমার চক্ষে জল আসিল, মনোরমার বিদ্যুল্লতাবৎ জ্যোতিপূর্ণ দেহে ও সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ মুখে যে এক ম্লান বিষাদ-ছায়া ছড়াইয়া রহিয়াছে, ক্ষীরোদা তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতৃজায়ার পত্র

খানি তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু তিনি মনের ভাব চাপা দিয়া কহিলেন, "বাঃ মনোরমা, বেশ বাংলোটি তো, চারিদিক্ খোলা, তাতে আবার বাগানটি কি সুন্দর! এমন জায়গায় আপনিই মন প্রফুল্ল হয়।"

বিনয় কহিল, "সন্তোষ বাবুর সখও খুব দেখচি। বিদেশেও খুব সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়েচেন, ঘরে আসবাব কিছু তো কম নয়, মায় হার্ম্মোনিয়াম পর্য্যন্ত—মনু তো ছোট বেলায় খুব গাইতে পারতো, না মা?"

মনোরমা তাড়াতাড়ি কহিল, "পিসিমা, বউ তো আননি, দাদার কি বিয়ে দাও নি?"

"না মা, দিতে তো চাই, কিন্তু এ বিদেশে বাঙালীর সংখ্যা খুব কম, তেমন মেয়ে পাচ্চি নে যে।"

"মেয়ের আর অভাব কি পিসিমা, বাঙালীর ঘরে মেয়ের জীবনের আর মূল্য কি? কুপাত্র অপাত্র তাদেরই গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে জোটে, আর দাদার মতো সুপাত্রের জন্য আপনি মেয়ে পাচ্চেন না?"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "মনু যে দাদাকে মস্ত সুপাত্র ঠাওরালে দেখছি। কিন্তু সুপাত্রের আসল বস্তুর যে বড় অভাব, টাকা—"

"কেন দাদা, আপনি তিনটে পাশ করেছেন, এখনো এম-এ পড়চেন, তিন চার হাজার টাকা তো লোকে সেধে আপনাকে দেবে।"

"না মনু, বিয়ে করে টাকা নিতে পারব না। মাকে বলেছি একটি ভাল পাত্রীর অনুসন্ধান কর মা। সে যেন দরিদ্রের মেয়ে হয়। তাকেই আমি বিয়ে করব। দেশের এক জনকে যদি কন্যাভার-মুক্ত করতে পারি, তাতেও যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করব। আমার মায়ের জাতকে আমি বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। দেশে তাদের যথেষ্ট নির্য্যাতন হচ্ছে, আমার প্রাণে তাতে বড়ই আঘাত লাগে।"

পুত্র-গৌরবে উৎফুল্লা ক্ষীরোদা স্নেহাপ্লুতকণ্ঠে কহিলেন, "তুই একা এই শত শত—সহস্র সহস্রের মধ্যে কি আর সদৃষ্টান্ত দেখাবি বাবা! তার চাইতে রজনীবাবুর মেয়েকে বিয়ে কর, মস্ত ধনী, মেয়েও পরমা সুন্দরী, আমরা কিছু চাইব না, তাঁরা আপনা হতেই যে যথেষ্ট দেবেন।"

জোড়হাতে বিনয় কহিল, "রক্ষে কর মা, রজনী বাবুরা তিন ভাই দুশ্চরিত্র, মাতাল,—তাদের গুণ তুমি তো জান মা! সে ঘরের মেয়ে আমি বিয়ে করব না।"

ক্ষীরোদা কহিল, "কি যে বলিস তার ঠিক নেই। বাপ খুড়ো মাতাল, তাতে মেয়ের কি দোষ? তোর অনাছিষ্টি কথা। পুরুষ পরশমণি, একটু কোথায় কি করলে পুরুষের তাতে কোন দোষ নেই, মেয়েদের পক্ষে তা মহাপাপ, হিন্দুর মেয়ে তা জানেও।"

বিনয় উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল, "না মা, মেয়েরা যতক্ষণ পুরুষদের কঠোর ভাবে না বিচার করবে, পুরুষরা ততক্ষণ

এই রকম অধঃপতিত থাকবে। আমি যেমন পবিত্রস্বভাবা নির্ম্মলচরিত্রা স্ত্রী চাই, প্রত্যেক মেয়েও যেন ঠিক সেইরূপ স্বামী চায়। তা হলে সকল পুরুষও সংযত হতে শিখবে। রজনীবাবুর বাড়ীর মেয়েদের পক্ষে এ কথা ভাবা এক প্রকার স্বাভাবিক হয়েছে যে, পুরুষের চরিত্রদোষ কিছুমাত্র নিন্দনীয় নয়। ছোট বেলাকার ধারণা মনের মধ্যে যে ছাপ মারে, তা কি দূর হয় মা?"

স্নেহভরে ক্ষীরোদা কহিলেন, "পাগল ছেলে, তোর এই সব কথা শুন্‌লে লোকে তোকেই পাগল বলবে। পুরুষের সঙ্গে মেয়ের তুলনা! দেখি মনু, তোর শাশুড়ী কি করছেন।" ক্ষীরোদা চলিয়া গেলেন। বিনয় মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মনু, তুমি কিছু বললে না যে! তোমার কি মনে হয়?"

ম্লান হাসি হাসিয়া মনোরমা কহিল, "দাদা, আমাদের বলবার কিছু নেই। পুরুষরা যে দয়া করে আমাদের ঘরে স্থান দিয়েছে, খেতে পরতে দিচ্চে এই যথেষ্ট। যদি মনের মধ্যে অভিযোগ মাথা তুলতে চায়, সেগুলিকে গলা টিপে মেরে ফেলাই নারীর মহত্ব।"

বিনয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এ কি কথা মনু! তোমার কথা যে নিতান্ত জড়ের মতো শোনাচ্চে! কথার প্রাণ কই—উৎসাহ কই? তোমরা মেয়েরা স্বেচ্ছায় যে নিজেদের হীন করে রেখেছ! তোমাদের আসন তোমরা

বেছে নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা কর,—পুরুষরা সম্ভ্রমে তোমাদের স্থান ছেড়ে দেবে। শক্তির অংশভূতা নারীর যে কত শক্তি আছে! শুধু ঘরকন্নার কাজ ছাড়া তোমাদেরও যে অনেক কাজ আছে মনু,—জড়ের মতো পড়ে থাকলে চলবে কেন?"

মনোরমা আজ এ কি নূতন বাণী শুনিল! তাও কি পুরুষের মুখে! পুরুষের এত বড় উদার প্রাণ, এত মহত্ত্ব-পূর্ণ, এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাহার প্রাণ কি এক অপূর্ব্বভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তার পর সে নীরবতাকে ভঙ্গ করিবার জন্য মনোরমার হস্তচ্যুত বইখানি তুলিয়া লইয়া বিনয় কহিল, "কি বই পড়ছ মনু? কৃষ্ণকান্তের উইল? রোহিণীর চরিত্র তোমার কি রকম বোধ হোলো? খুবই খারাপ নয় কি?" মনোরমা কহিল, "নিশ্চয়! নারীজাতির মুখে কি কলঙ্ক কালীই না সে লেপে দিয়েছে!"

বিনয় কহিল, "আর পুরুষ জাতির মুখে কি কিছু কম কালি লেপেছে কাপুরুষ হরলাল! বিয়ে করব বলে রোহিণীকে দিয়ে উইল চুরি করিয়ে শেষে নির্লজ্জের মত কি জবাব না তাকে দিলে? রোহিণী যা অন্যায় করেছিল, সে কাদের অত্যাচারে? কাদের নির্যাতনে? অথচ সমাজ স্বচ্ছন্দে রোহিণীকে বড় গলায় পাপীয়সী, দুশ্চারিণী বোলে, তার মৃত্যুর পর তাকে অনন্ত নরকবাসিনী

প্রেতিনী দেখে খুব সুখী হল। একবার কি কেউ ভেবে-ছিল যে, অবস্থা বিশেষে এই রোহিণীর চরিত্রই আবার আদর্শ সতী নারীর চরিত্রে গঠিত হোতে পারতো? সে অসহায়া বালবিধবা, চরিত্ররক্ষা করবার, বা সুপথে থেকে আত্মরক্ষা করবার মত কোনো শিক্ষা পায় নি, এ অবস্থায় তার যে অধঃপতন হয়েছিল, সে কিছু অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। এমন কয়জন সমদর্শী আছেন যাঁর কাছে বাস্তব পুরুষ নারীর ভেদ নেই, যিনি তুল্যরূপে উভয়কেই ক্ষমা করেন, উভয়েরই বিচার করেন? আমি তো রোহিণীকে এতটুকু ঘৃণা করি না, শুধু তার প্রতি সহানুভূতিতে আমার প্রাণ পূর্ণ হয়।"

মনোরমা আশ্চর্য্য হইয়া গেল. সেদিন সে সমালোচনায় পড়িয়াছিল রোহিণী পিশাচী, আর ভ্রমর দেবী, সমালোচক নিপুণতার সহিত উভয় নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। মনোরমা কহিল, "দাদা আপনি যাই বলুন, রোহিণী ভ্রমরের তুলনায় পিশাচী নয় কি?"

বিনয় কহিল, "মনু, তুমি যে আবার ভুলে যাচ্ছ, ভ্রমরের অবস্থায় থাকলে রোহিণীও দেবী হতে পারতো! কাদার উপর—পাঁকের উপর যাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তার গায়ে যে কাদা পাঁক লাগবে তা আর আশ্চর্য্য কি?"

এমন সময় অন্নপূর্ণা আসিয়া কহিলেন, "এস বাবা

বিনয়, কিছু খাবে এস, তোমার মতো ছেলে যেন সবার ঘরে হয় বাবা।"

বিনয় জানিত, তাহার স্নেহময়ী মাতা সকলের নিকট পুত্রের প্রশংসায় যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, এখানেও করিয়াছেন। তাই সে হাসিয়া কহিল, "মায়ের কাছে আমার সুখ্যাতি শুনেছেন বুঝি? পরের মুখে ঝাল খাবেন না, নিজের জিনিষের তারিফ সবাই করে থাকে, মায়ের একটি ছেলে, কাজেই খুব বাড়িয়ে দেখেন, আর কি!"

"একা এক সহস্র হয়ে মায়ের কোল-জোড়া করে থাক বাবা, মা দুর্গা তোমার ভাল করুন। এস বাবা,—বৌমা, পাণ নিয়ে এস।"

১০

স্কুল প্রত্যাগত বিনয় চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া একমনে স্কুলের প্রয়োজনীয় বিষয় কি কি লিখিতেছে, ক্ষীরোদা জল খাবারের রেকাবীখানি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, "বাছা মুখ হাত ধুয়ে একটু জল টল খেয়ে যা ইচ্ছে কর, শরীরটা আগে বজায় রেখে তবে অন্য কাজ। রাত দিন খাটুনিতে বাঁচবি কেমন করে? একদিনও খাবার চেয়ে খেতে দেখি নে।"

বিনয় হাসিয়া লেখা স্থগিত রাখিল। উঠিয়া মুখ ধুইয়া খাইতে বসিল। আবার হাসিয়া কহিল, "আমার হয়ে যে

সর্ব্বদা তুমি মনে রাখছ মা, সে জন্য খাবার কথা স্মরণ রাখবার আমার দরকার হয় না। তবে পেটটা এক একবার তাগিদ করে বটে। তা আমার জননী অন্নপূর্ণা সর্ব্বক্ষণই আহার্য্য প্রস্তুত করে বসে আছেন, সুতরাং পেটের তাগিদ শোনবার অবসর কই? আজ মা বড় ব্যস্ত আছি, রাতে বাড়ী থাকব না, ক্ষুদ্র্মনিয়ার মাকে শুতে বোলো, লেখা-শুনা সেরে এখনি বেরোব।"

ক্ষীরোদা কহিলেন, "বাব একটু সাবধানে চলিস্, সহরে প্লেগ দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা লাগিয়ে ঘোরাঘুরি করিস্ নে। রাতে আজ বাড়ী থাকবি না কেন?"

"যদুবাবুর প্লেগ হয়েছে, বাড়ীতে তিনটি ছোট ছেলে নিয়ে তাঁর স্ত্রী একা, খারাপ রোগ, কেউ এগুতে চায় না, কাজেই—"

ক্ষীরোদা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো তুই আছিস্ আর কি? যদুবাবুর বাড়ী যে সন্ধ্যে-বেলা প্রত্যহ দাবা ও পাশার আড্ডা ছিল, ছেলে বুড়ো সবাই জুটে খেলতো আর তামাক পুড়তো, এখন তারা সব কোথায় গেল? অসময়ে কারো দেখা নেই?"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "তোমার তো মা জানাই আছে, অসময়ে বড় একটা কারো দেখা পাওয়া যায় না, যা হোক, অন্যের দিকে আমাদের দেখবার দরকার কি? আমাদের প্রতিবাসীর প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে তো? লোকটা

কি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে? আমি যাব মা, তুমি কিছু মনে কোরো না।"

ক্ষীরোদার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি কহিলেন, "লোকের সেবায় অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাতে আমি বাধা দি কেমন করে? কিন্তু বাছা, ছোঁয়াচে ব্যারাম, সবাই যে ভয় পায়। আমায় রেখে আয়, আমি প্রাণপণে সেবা করব, তুই যাস্ নে বাছা।"

সানন্দে বিনয়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কহিল, "এই তো মায়ের মতন কথা! বেশ মা, চল, আমরা দু'জনে যাব। ভয় কি মা তোমার আশীর্ব্বাদ অক্ষয় কবচের মত আমাকে সকল বিপদ—সকল ভয় হ'তে রক্ষা করবে। তুমি তো মা অন্য মেয়েদের মত দুর্ব্বল-চিত্ত—সঙ্কীর্ণমনা নও, সেই জন্যই আমার এত মনের বল, এত গৌরব। তোমরা মা জগৎমাতার প্রতিভূ। যিনি মা, তিনি কি একজনেরই মা? তা তো নয়, তিনি সকল শোকার্ত্তের, সকল ব্যথিতেরই যে মা। নইলে মা নামের সার্থকতা হয় কই? তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে মা আমি সকল বিপদের সম্মুখীন হতে পারি।"

বিনয় ভক্তিভরে মাতার পদধূলি লইল। ক্ষীরোদা সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আজ তোর মামীমার চিঠি এসেছে, পড়ে বড় মনটা খারাপ আছে. মনুর জন্যে বড় মন কেমন করে, আহা। অমন সোণার প্রতিমা,

বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আমার বড় সাধ ছিল বউ করবার ; কিন্তু তখন বলতে সাহস হয় নি। বউ এখন সেই কথাই লিখেছে। সকলি অদৃষ্ট, তা ছাড়া আর পথ কি ?"

চিঠিখানি টেবিলে রাখিয়া গৃহকাজে ক্ষীরোদা চলিয়া গেলেন। বিনয় একমনে নিজের প্রয়োজনীয় লেখা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার দৃষ্টি চিঠির উপর পড়িল। অন্যমনস্ক থাকা বশতঃ মায়ের শেষ কথাগুলিতে সে তখন ভাল করিয়া কাণ দেয় নাই। এখন চিঠিখানি বিনয় পড়িতে লাগিল :

"প্রিয় ভগ্নি !

ক্ষীরোদা, তোমার চিঠি পেয়ে একটু আশ্বস্ত হ'লাম। মনের দুঃখ তোমায় বলে তবু একটু জুড়ুই। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটা মেয়ে,—তা কি না তার অদৃষ্টে এমন হ'ল। আমার যেমন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভগবান্ তেমনি চূর্ণ করেছেন। আজ বোন্ তোমার কাছে সত্য কথা বলতে কি, আগে এক একবার মনে হোত, বিনয় যেমন মার একটি ছেলে, লেখা পড়ায় মনোযোগী, বাপ মার কথার বাধ্য, ঐ ছেলেটির সঙ্গে আমার আদরের মনুর বিয়ে দিলে বেশ হয়। কিন্তু তোমাদের অবস্থার অসচ্ছলতার জন্য আবার মন বিরূপ হোত। আসল কথা বোন্ আমার অদৃষ্টই মন্দ। বিয়ের আগে ভাল করে খোঁজ খবর নিতে পারি নি। জামাই রূপে ধনে শ্রেষ্ঠ হলে কি হবে, দুশ্চরিত্র দুষ্ক্রিয়াসক্ত বলে সব মাটী

হয়ে গেছে। হায় হায়, আমার মনু কোথা আজ স্বামীর আদরে আদরিণী হয়ে থাকবে, তা নয়, বাছা এই ছেলে-বয়সে সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে! মা আমার বড় চাপা, চিঠিতে কিছু লেখে না। এক আধটি কথায় কিন্তু তার প্রাণের দুঃখ আমি বুঝতে পারি। তুমি মাঝে মাঝে দেখা শুনা কোরো, মনোরমাকেও সৎশিক্ষা দিও। ভগবান্ করুন সন্তোষের মন যেন পরিবর্ত্তিত হয়। মেয়ে যে অভিমানিনী, ভয় হয়, কোন্ দিন মনের কষ্টে আত্মহত্যা না করে বসে।" * *

মনোরমার অবস্থা জানিয়া বিনয় বড় ব্যথিত হইল। আহা! অমন মেয়ে, তাহার অদৃষ্টে এমনই নিগ্রহ ছিল! সন্তোষ এমন স্ত্রীর কদর বুঝিল না। আর একটা কথা বিনয়ের মধ্যে বড় সাড়া দিল,—তাহার শৈশব-সঙ্গিনী আদরিণী মনোরমা যদি তাহারই পত্নী হইত, সে তাহা হইলে সুখী হইত কি? কি সুন্দর মধুর কল্পনা! স্নেহের মনোরমাকে সে শতগুণ স্নেহে সমাদরে বক্ষের মধ্যে স্থান দিত। কিন্তু এ কি দুশ্চিন্তা! মনোরমা পরস্ত্রী, আজ এ ভাবে তাহার চিন্তা মহাপাপ। বিনয় তখনই সে সকল কথা ভুলিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া, অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

১১

একদিন মনোরমা গৃহমধ্যে বসিয়া আছে। সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া স্থানীয় প্রচারিকা মিস্ বুরেশ মহোৎসাহে

বাইবেল পাঠ করিয়া তাহার তত্ত্ব মনোরমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন! সেই সময়ে সন্তোষ দ্বারের নিকট আসিয়া গৃহের মধ্যে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কামিনীর অনুসন্ধান করিল! এবং সে নাই দেখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মিস্‌কে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল। মিস্ বুরেশ ইতিপূর্ব্বে সন্তোষের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। সন্তোষের সহিত তাঁহার আলাপও হইয়াছিল। তিনিও সন্তোষকে নমস্কার করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। সন্তোষ কথা জমাইবার জন্য কহিল, "মিস্ বুরেশ, আমি অনেক দিন আগে একবার বাইবেল পড়েছিলাম, আমার তা বড় ভাল লেগেছিল। আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে আসবেন, আপনার কাছে তা হলে বাইবেল সম্বন্ধে আবার শুনতে পাব।"

উৎসাহে কুমারীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কুমারী সুদূর আমেরিকা হইতে নূতন এই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ধনী পিতা মাতার আদরিণী সুন্দরী যুবতী কন্যা, সুতরাং অনেক পদস্থ যুবক কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু শৈশব হইতেই কুমারীর মনের গতি অন্যরূপ। ধর্ম্মতৃষ্ণা তাঁহার প্রবল, পিতা মাতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুমারী আমেরিকা মিশনে কার্য্য লইয়া সুদূর ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন। কুমারীর নবীন উৎসাহ, নবীন আশা ও উদ্যম। কুমারী ভাবিতেন,

যীশুর পবিত্র নামে অতি সহজেই ভারতের দুর্দ্দশাপন্ন নর-নারীকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পাপের পথ হইতে ফিরাইয়া নবজীবন দিতে পারিবেন। সন্তোষের কথায় কুমারীর বড় আনন্দ হইল। তিনি সাগ্রহে কহিলেন, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, প্রভু যীশুর রক্তের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণ পবিত্র হউক।" মনোরমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আজ কামিনী আসে নি কেন? আমার যাবার সময় হোল, আজ চল্‌লাম, এবারে যেদিন আসব, কামিনীকে ডেকে পাঠিয়ো।"

মনোরমা কহিল, "তিনটা বাজে, আপনার টিফিনের সময় হয়েছে যে।"

সন্তোষ কহিল, "বেশ তো, আমারও জল খাবার সময় হয়েছে। মনোরমা, তুমি দু'খানা রেকাবি শীগগির সাজিয়ে নিয়ে এস।" মনোরমা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া দুইখানি রেকাবীতে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। সন্তোষ কুমারীকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। কুমারী কহি-লেন, "মনোরমা, তুমি খাবে না? তোমার জাত যাবে বুঝি? আমি জানি, মেয়েরা বলে, পুরুষদের জাত যায় না, মেয়েদের যায়,—নয় কি সন্তোষ বাবু?"

সন্তোষ কহিল "আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে।"

এমন সময় বিনয় আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

মনোরমা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিল, "বসুন দাদা, পিসীমাও এসেছেন না কি ?

"না, আমি একাই এসেছি। সন্তোষ বাবু, ভাল তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনি মিস্ বুরেশ, আলাপ করুন। দেশের সম্বন্ধে আপনি তো খুব তর্ক করতে পারেন। এখ্‌নি আমি মিস্‌কে বলছিলাম, আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কার আছে।"

বিনয় সসম্মানে মিস্‌কে অভিবাদন করিয়া কহিল, "আমাদের দেশের জন্য যদি আপনার প্রাণ করুণায় পূর্ণ হয়ে থাকে, সে জন্য আপনাকে আমার শত ধন্যবাদ। কিন্তু আমার এই অনুরোধ, বিচারকের আসনে বসে আমাদের দেশের দোষগুণ বিচার করবেন না, বন্ধুর আসনে বসে হিতসাধন চেষ্টা করবেন, এই আমার প্রার্থনা।"

কুমারী ততক্ষণ আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আহারান্তে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "বাবু, আপনারা তো বেশ লেখাপড়া শিখেছেন, মেয়েদের জন্য শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছেন কেন ?"

ইতিমধ্যে খোকাকে কোলে লইয়া কামিনী আসিল। সে গৃহমধ্যে যেমন প্রবেশ করিতে যাইবে, সন্তোষ ও বিনয়কে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া ঘোমটা টানিয়া প্রস্থান করিল। কুমারী হাসিয়া কহিলেন, "বাঘ ভালুকের চেয়ে মেয়েরা দেখছি পুরুষকে বেশী ভয় পায়, এটা আমার বড় আশ্চর্য্য মনে হয়।"

সন্তোষ উৎসাহিত হইয়া কহিল, "অথচ ঐ কামিনীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর খুব বন্ধুত্ব। আমাদের দেশে এই যে অবরোধ-প্রথা এটা নিশ্চয়ই অজ্ঞান্ত কুসংস্কারের ফল।"

কথাটা মনোরমার অসহ্য বোধ হইল। তাই সে বলিল, "এই অবরোধ প্রথা আছে বলেই মেয়েদের সম্মান বেঁচে আছে। নইলে পুরুষদের নির্লজ্জ দৃষ্টির সম্মুখে তাদের ভস্ম হয়ে যেতে হোত।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "না মনোরমা, তুমি ভুল বলচ। ভস্ম যা হবে, সেটা ছাই মাটি খাদ মাত্র। আসল জিনিষ আরও নির্মল খাঁটি হ'য়ে দাঁড়াবে। পুরুষদের অতটা নীচ করে ভাবছ কেন?"

হায়, এ কেনর উত্তর কি? সন্তোষ কহিল, "দু'খানা বই পড়ে ওর পাণ্ডিত্য দেখা কন।"

মনোরমা সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া কহিল, "আমার মনে হয়, দেশের যে অবস্থা- তাতে স্থান কাল পাত্র ভেদে এই অবরোধ-প্রথা মেয়েদের পক্ষে ভাল বই মন্দ নয়। পুরুষেরা মেয়েদের যে চক্ষে দেখে,—"

"না মনোরমা, ও সকল মন্দর দিক ভাবলে চলবে না, আরও একটু উদারভাবে চিন্তা করতে হবে। মেয়েরা সকল জড়তা, সকল সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করে, সহজ সরল ভাবে আপনার পথে চললে, পুরুষের সকল দাম্ভিকতা, সকল ধৃষ্টতা, সকল নির্লজ্জতা আপনি সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। আমি জানি

ও বিশ্বাস করি, আমার দেশ তার মায়ের জাতিকে যতটা শ্রদ্ধা সম্মান করতে পারে, অতটা আর কেউ পারে না।"

মনোরমা অস্ফুট স্বরে কহিল, "আপনি নিজের মতন সকলকার স্বভাব মনে করছেন ; সংসারে পিশাচ প্রকৃতির যে অভাব নেই তা ভাবচেন না।"

বিনয় স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তা থাকুক, দেবত্বের সঙ্গে পিশাচপ্রকৃতির সংগ্রাম কতক্ষণ? কুমারী বুকেশ, আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় প্রীত হলাম। আপনার কথা আমি সেদিন আমার ভগ্নীর নিকট শুনেছি। আপনি ভারতবর্ষকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, নয় কি?"

কুমারী প্রফুল্ল হইয়া কহিল "আমি কল্পনায় ভারতবর্ষকে বহুদিন হ'তে দেখে আসছি। এখন তো প্রত্যক্ষ দেখছি। আমি যথার্থই এ দেশকে বড় ভালবাসি। কিসে এখানে সকলের উন্নতি হবে, তাই আমার আন্তরিক বাসনা। আমি একটি স্কুল খুলেছি, সেখানে অনেক গুলি মেয়ে পেয়েছি। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আমার প্রধান উদ্দেশ্য। প্লেগে গরীব দুঃখীরা বড় কষ্ট পাচ্ছে, মরছেও বিস্তর,—সেবার অভাবেই বেশী মরছে। আমরা একটা সেবা-সমিতি খুলেছি। আজকাল আমরা বড় ব্যস্ত—যেহেতু সহরে রোগ খুব দেখা দিয়েছে।"

সন্তোষ কহিল, "মা সেই জন্যে সহর ছাড়তে বড় ব্যস্ত হয়েছেন,—আমরা বোধ হয় শীগগির কলকাতায় ফিরবো।"

বিনয় কহিল, "ধন্যবাদ কুমারী, হতভাগা নিঃসম্বল দরিদ্রের কুটীরে আপনারা মূর্ত্তিমতী দেবীর মতন কল্যাণ-হস্তে যে সেবা করছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ আপনাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস ও প্রেমকে, যেহেতু, সেই বলেই বলীয়ান্ হয়েই আপনারা এ কাজ করতে পারছেন। মনোরমা, দেখ, আমরা প্রতিবাসীর রোগে, ভয় পেয়ে পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছি, আর ওঁরা নিজেদের প্রাণভয় দূর করে, অভয়ার মত সেই ভয়ের স্থানে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দমনে সেবা করছেন, আর ভয়ার্ত্তকে অভয় দান করছেন। কবে আমাদের দেশের মেয়েদের মন এমনি নির্ভীক, এমনি প্রেমপূর্ণ, এমনি বিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠবে! শুধু পুঁথিগত লেখাপড়ায় কিছু হবে না। সজীব কর্ম্ম-প্রাণ হৃদয় চাই, ত্যাগস্বীকার চাই আমরা পুরুষরাও অগ্রসর হ'তে পারছি না, মেয়েরা আমাদের পিছু হতে টেনে রাখছেন বলে। তাঁরা এসে আমাদের সঙ্গে সমানে না চললে আমাদের গতি বাধা পাচ্ছে।"

সন্তোষ অসহিষ্ণুভাবে কহিল, "আমি উঠলাম, ওসব কথা আমার মাথায় বড় ঢোকে না। ততক্ষণ কাজের মত কিছু করিগে। কুমারী আসুন, আপনারও সময় হয়ে গেছে, এগিয়ে দিই চলুন।"

কুমারী ও সন্তোষ চলিয়া গেল। মনোরমা নতমুখে কি ভাবিতেছিল। বিনয় কহিল, "মনু, কি ভাবছ? ভাল

আছ তো ?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনোরমা কহিল, "ভাল ? তা—আছি বই কি। শরীর তো রোগশূন্য।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "আর মন ? সেটা যে নীরোগ, তা অবশ্য বলতে সাহস করবে না।"

মনোরমার চক্ষে জল আসিল ; বিনয় লজ্জিত হইল। মনে মনে ভাবিল, বালিকার মনের ব্যথা আমি জানিতে পারিয়াছি সেই জন্য বুঝি লজ্জিত হইল ?

সহসা বিনয়ের ভাবান্তর হইল। মনোরমার মাতার পত্রের কথা স্মরণ হইল। হায়, সে পত্রের কথা যদি সত্য হইত, এই জ্যোৎস্নারূপিণী সর্ব্বসুলক্ষণা নারী যদি তাহার পত্নী হইত! কিন্তু এ কি অনধিকার-চিন্তা! বিনয় নিজেকে সংযত করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে কহিল, "মনু, তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তাতেই অধীর হলে চলবে কেন ? শুধু স্বার্থের জন্যই কি এ দুর্লভ মানব-জন্ম ? নিজের জন্যই শুধু ভাববে ? সংসারে তা ছাড়া কি কিছু ভাববার নেই ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া মনোরমা কহিল, "আমি তো কিছু ভাববার পাই না! আপনি না হয় কিছু দেখিয়ে দিন।" কথাটা বিদ্রূপের মত শুনাইল, ভাবিয়া মনোরমা লজ্জিত হইল। পরক্ষণেই কহিল, "না দাদা, আপনাকে সত্য বলছি, সময়ে সময়ে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠে মুক্তি চায়,—তা সে দেহ হতেই হোক, কিম্বা প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতেই হোক।"

বিনয়ও বিষম সমস্যায় পড়িল। অবরোধবাসিনী হিন্দুরমণীকে সে স্বামিসেবা ভিন্ন আর কি ভাবিবার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে? জগতের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার দ্বার যে রুদ্ধ,—সে দ্বার খুলিয়া দিবার শক্তি তাহার কই? অধিকারই বা কি? সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল, রমানাথ বাবু শীঘ্র আসিবেন লিখিয়াছেন। সে কহিল "মনু তোমার বাবা বোধ হয় শীগগির আসবেন।"

এ সংবাদে মনোরমা প্রীত হইল না, যেহেতু সে জানে, তাহার পিতা মাতা কন্যার জন্য সর্ব্বদাই মনোকষ্ট ভোগ করিতেছেন। কন্যাকে দেখিলে তাঁহারা অধিকতর যাতনাই পাইবেন মাত্র। মনোরমা কহিল, "এখানে তাঁর এখন না আসাই ভাল,—প্লেগের যে উপদ্রব! ভাল কথা, যে ভদ্র-লোকটির আপনি ও পিসিমা সেবা করলেন, তিনি তো মারা গেলেন,—তাঁর স্ত্রীপুত্র কোথায় এখন?"

বিনয় কহিল, "আমার বাসায় আছেন। বৌটির বাপ মা নেই, শ্বশুরবাড়ীরও কেউ নেই, কেঁদে ও ভেবে আকুল হয়েছিল, আমি সান্ত্বনা দিয়ে নিজের বাড়ীতে এখন রেখেছি।"

বিনয়ের মহত্ত্বে মুগ্ধ মনোরমা, বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে কহিল, "আহা, আপনি মানুষের মত কাজ করেছেন। দাদা, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার কাছে কিছু টাকা আছে, আমি সেই অভাগিনীর ছেলে মেয়ের জন্য

সাহায্য কোরব। তিনটি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কি করে তার দিন চলবে, আপনিই বা কদ্দিন রাখবেন ?"

"না মনু আমি তাঁকে পরমুখাপেক্ষী কোরে রাখতে চাই নে। যাতে ভবিষ্যতে তিনি নিজেই নিজের খরচ চালাতে পারেন সেই পথ দেখিয়ে দেব। একটু প্রকৃতিস্থ হলে মিসনরী মেমের কাছে তাঁকে লেখাপড়া ও সেলাই শিখতে দেব। আমার মাও সময় মত কিছু কিছু শেখাবেন। তাঁর বেশ বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, শীগ্‌গিরই তিনি উন্নতি করবেন। তার পর একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া মনোরমা কহিল, "কিন্তু দাদা, ও রকম অবস্থায় মেমেরা সুযোগ পেলে প্রায়ই মেয়েদের নিয়ে গিয়ে খৃষ্টান করে।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "সে দোষ কার মনু মেমদের না মেয়েদের ? তার জন্য যে আমরাই দোষী ? লক্ষ্যহীন কর্ম্মহীন, জীবনটাকে সহানুভূতি না করে, আর একটা লক্ষ্য নির্দ্দেশ না করে দিয়ে, তাকে আবর্জ্জনার চাপে নিষ্পেষণ করতে থাকব,—তা হতে সে মুক্তি পাবার জন্য ছুটে পালালেই তার দোষ ? আর সেই মুক্তির পথে যে টেনে নিয়ে যাব, তার দোষ ? ধিক্ আমাদের।"

বিনয়ের উৎসাহদীপ্ত সমুজ্জ্বল প্রশান্ত চক্ষু দু'টির প্রতি চাহিয়া মনোরমা ভাবিল, "কি সুন্দর কথা, মহৎ হৃদয়ের কি উদার ভাব। নারীজাতীর প্রতি এত যাহার করুণা,

ধন্য তাহার মহৎ হৃদয়! আর ধন্য সেই ভাগ্যবতী নারী, যে ইহার পত্নীত্ব-সৌভাগ্য লাভ করিবে। কৌতূহলবশতঃ মনোরমা কহিল, "দাদা, আপনি বিয়ে করছেন কবে? পিসিমা একলাটি থাকেন, আপনি বিয়ে করলে বৌটি কাজেরও দোসর হয়।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "আর আমার কাজেরও বাধা হয়।"

"কেন? তখন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবেন! আপনাদের দৌড় কি এই পর্য্যন্ত না কি? এই আপনার উদ্দীপনা? সব ভুয়ো বক্তৃতাই সার?"

হাসিয়া বিনয় কহিল, "আমার হার হয়েছে, বিয়ে যখনি করি, নিমন্ত্রণ তোমাদের করবই।"

"সে তো করবেনই, কিন্তু আসছি না তো। এখন করলে সশরীরে উপস্থিত থাকতাম, নিমন্ত্রণটাও খেতাম, বৌও দেখতাম।"

"আর যদি তোমাদের দেশে গিয়ে করি? মা যে ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁর মত এক গুণ ব্যস্ততা যদি আমার থাকতো।"

হাসিতে হাসিতে মনোরমা কহিল, "অন্ততঃ প্রকাশ্যে।"

"ভিতরের খবর আর কে জান্‌তে যাচ্ছে।"

সহসা ঝন্ ঝন্ শব্দে উভয়েই চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, যে বিড়ালটি এতক্ষণ গৃহের একপার্শ্বে বসিয়া টিপা-

য়ের উপরস্থিত দুধের বাটির দিকে লুব্ধদৃষ্টে চাহিয়াছিল, অথচ পান করিবার কোন সুযোগ পায় নাই, তথাপি নিরাশ না হইয়া, শুভ অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে এখন গৃহস্বামিনীকে কথা বার্ত্তায় অন্যমনস্ক দেখিয়া যেমন লাফ দিয়া টেবিলের উপর উঠিতে গেল, দুর্ভাগ্যবশতঃ টেবিলের উপর হইতে কাচের চিমনীটি ঝনাৎ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। বিড়ালটি বেগতিক দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দ্রুত পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিল না। বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল, "বিড়ালটার অদৃষ্ট বড় মন্দ! দুধের বাটী সামনে পেয়েও পান করতে পেলে না, আহা বেচারী!"

কথাটা মনোরমার প্রাণে বাজিল, সে কহিল, "মানুষের অদৃষ্টেও সময়ে সময়ে তাই হয়।"

১২

"শুধু সে রেখে গেল চরণ রেখা গো—"

মনোরমা তাহার সুধাপূর্ণ কণ্ঠস্বর হার্ম্মোনিয়মের সহিত মিলাইয়া গান ধরিয়াছে, কামিনী একাগ্রচিত্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। তাহারই আগ্রহে মনোরমা গাহিতেছে, নতুবা—যদিও গীত-বাদ্য তাহার বড় প্রিয় ছিল, তথাপি সে আর তাহার চর্চ্চা করে না। কামিনীর শিশুটিও তন্ময়-চিত্তে বাজনা শুনিয়া নিজের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেছে।

"আর না ফিরিয়া দিল সে দেখা গো—"

প্রতি ছত্রে কি আকুলতা ! কি মর্ম্মস্পর্শী সকরুণ ভাব !

"শুধু সে প্রীতিধারা, মধুর স্নেহরাশি,
পিয়াসা আকুলিত করুণ মৃদু হাসি,
সেই সে রেখে গেছে, আঁধার হৃদি মাঝে,
তা'লয়ে বসে আছি বিজনে একা গো !"

বার বার এই শেষ ছত্র কয়টি মনোরমা আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল, আহা ! কোন সে বিরহ-কাতর হৃদয় তাহার চির প্রিয়ের উদ্দেশে এ সঙ্গীত রচনা করিয়াছে ! কিন্তু এই বিরহও কত মধুর ! প্রিয়তমের স্মৃতিই যে এই বিরহের মধ্যেও তাহার চিরসান্নিধ্য অনুভব করাইয়া দিতেছে ! মনোরমার ললাটে মুক্তাতুল্য স্বেদবিন্দু দেখা দিল। গান শেষ করিয়া সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা কামিনী কহিল, "কি মিষ্টি গলা, বৌ-রাণী, আজ আমার জন্ম সার্থক হোল।"

সরলা কামিনী বিস্মিত নয়নে এই অতুলনীয়া সুন্দরীর রূপ-গুণসম্পন্না দেহখানির দিকে চাহিয়া তাহাকে পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞান করিতেছিল। কিন্তু হায়, মনোরমার হৃদয়—সেখানে যে কি আগুন জ্বলিতেছিল, তাহা সে কেমন করিয়া বুঝিবে ?

দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্য, দারুণ শীতের শীতল দিবসটিকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। সম্মুখস্থ মাঠে দরিদ্র নরনারী

সেই রৌদ্রটুকু পরম আরামের সহিত উপভোগ করিতে করিতে গল্প করিতেছে, একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছে দোলনা বাঁধিয়া একদল ছেলেমেয়ে মহাকলরবে দোল খাইতেছে; একদল মেষ ও মেষশাবক স্বচ্ছন্দে সেই মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছে। মাঠে ঘাস খুবই অল্প, তবু সেই মেষদল এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাহা খুঁটিয়া খাইতেছিল, তাহাতেই তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিল না।

মনোরমা কামিনীকে কহিল, "আচ্ছা, ঐ ভেড়াগুলো চরছে—ওরা এক জায়গাতেই দল বেঁধে রয়েছে কেন? গরু কি ছাগলের মতন এদিকে ওদিকে না গিয়ে সবগুলি এক জায়গাতেই চরছে।"

কামিনী কহিল, "কেন বৌরাণী, আপনি কি ভেড়ার দল কখনও দেখেন নি? ওদের একটা যেদিকে যাবে সবগুলি সেইদিকে যাবে, ওরা দল ছাড়া হয় না।"

মনোরমা কহিল, "আমি কলকাতায় এসব দেখিনি, সেখানে এত বড় খোলা মাঠ কোথায়? বড় বড় রাস্তা, গাড়ি ঘোড়া ট্রাম, বড় বড় দোকান, এই সবই আমরা আজন্ম দেখে মানুষ হয়েছি।"

কামিনীরা দুই তিন পুরুষ এদেশে বাস করিতেছে, কলিকাতার সম্বন্ধে সে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শোনে। কলিকাতার কালীঘাট ও যাদুঘর দেখিবার বড় তাহার সাধ। কিন্তু তাহাদের মত অবস্থার লোকের পক্ষে তাহা

দুরাশা। সে মনোরমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ করে।

কামিনী ছোট বেলায় পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। সুতরাং স্নেহ-তৃষাতুর হৃদয়, মনোরমার নিকট তাহার পিতামাতার কথা, তাহার শৈশবকাহিনী, পিতামাতার নিকট তাহার আদর আব্দারের কথা শুনিতে বড় ভালবাসে। মনোরমাও হঠাৎ বড় গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। উপস্থিত তাহার সঙ্গিনীর সঙ্গ তাহাকে আবার চঞ্চল ও লঘুপ্রকৃতি করিয়া তুলিতেছে। সেও সরল চিত্তে, খোলা প্রাণে নিজের ছোট বেলাকার অমূল্য দিনগুলির গল্প কামিনীর নিকট করিয়া তৃপ্তি অনুভব করে। কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বৌ-রাণী, আপনার সেখানে ভাল লাগতো, না এখানে ভাল লাগছে?"

মনোরমার ললাট কুঞ্চিত হইল, কহিল, "এখানে এক রকম বেশ আছি, সেখানে যেন, থেকে থেকে হাঁপ ধরতো। শীগগিরই ফিরতে হবে শুনছি, আমার যেন ভয় হচ্ছে।"

কামিনী অবাক্ হইয়া গেল, সে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কলিকাতায় পিতামাতার আদরিণী কন্যা এতদিন পরে পিতামাতার নিকট ফিরিয়া যাইবে, তাহাতে উভয় পক্ষেরই কত আনন্দ হওয়া উচিত; অথচ মনোরমার তাহাতে আগ্রহ নাই!

কামিনী আগ্রহভরে কহিল, "কেন বৌ-রাণী, এ কথা

কেন বলছেন? বাপ-মার কাছে ফিরে যেতে মন হয় না?"

নিশ্বাস ফেলিয়া মনোরমা কহিল, "তুমি বুঝবে না বোন্! বাপ-মা আমায় দেখলে মনে কষ্ট পান, আমার জন্য ভেবে তাঁরা বড় দুঃখিত থাকেন। বাপের বাড়ী আর আমার ভাই বোন্ নেই যে, তাদের নিয়ে তাঁরা ভুলে থাকবেন। আমি পোড়াকপালী তাঁদের অশান্তির কারণ হয়ে রইলাম মাত্র।"

জামাতার স্বভাব চরিত্র ভাল নয়; পুরুষের পক্ষে চরিত্রদোষ এত কি অস্বাভাবিক যে, তার জন্য পিতা-মাতা পর্য্যন্ত বিমর্ষ হইয়া থাকিতে পারে! ইহা কামিনীর বোধগম্য হইল না; অথচ সাহস করিয়া সে আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও পারিল না।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে দাসী চীৎকার করিয়া কহিল, "অহো! মাঃয়া; খোকা বাবুয়া কোন তামাসা লাগায়া হ্যায়, আউর তু গপ্পে বেহোঁস হো গিয়া।"

চমকিয়া দুইজনে পশ্চাৎ ফিরিয়া খোকার মসীচিক্কণ মূর্ত্তি দেখিল। কোন্ ফাঁকে খোকা মনোরমার কালীপূর্ণ দোয়াতটি লইয়া মনের সাধে কালী খাইয়া মুখে বুকে পেটে লেপিয়াছে। মনোরমা হাসিয়া উঠিল। কামিনী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "আঃ পোড়াকপাল, যা পাবে তাই পেটে পুরবে। এই শীতে জল ঘেঁটে

ঘেঁটে অসুখ হবে যে। এখন না ধোয়ালে উপায়ই বা কি?"

কামিনী খোকার হাত হইতে দোয়াত কাড়িয়া লইল। খোকা প্রথমে আপত্তি করিল, "দিব না, কিছুতেই না" আপত্তি জানাইল; কিন্তু "জোর যার মুল্লুক তার" বুঝিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কামিনী খোকাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া আসিয়া বসিল। কামিনী কহিল, "আপনি যে মাকে চিঠি লিখবেন বলেছিলেন, তা লিখুন, শুনে যাই।"

কামিনীর মাতৃস্নেহাতুর হৃদয় মাতা ও কন্যার পত্রের আদান প্রদান সবিস্তার শুনিতে বড় ভালবাসিত।

মনোরমা বলিয়া উঠিল, "পিয়ারীর মা, ঐ ভেড়ার ছানাটি বড় সুন্দর, কোলে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। একবার ধরে আন না।"

দাসী কহিল, "এ মাই, বাচ্চা পাকড়েনে সে সব ভেড়ী হামারা পিছু আওয়ে গা, বহু-রাণীকো ই কোন্ খেল হোগা।"

মনোরমার কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। তখন দাসী মেষ-শাবকটিকে ধরিতে গেল, উহাকে লইয়া আসিবার সময় দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। নচেৎ চীৎকার রবে মেষপাল নিঃসন্দেহ গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিত। মনোরমা শাবকটিকে কোলে লইল। খোকার তো আর আনন্দের সীমা নাই, নানা অব্যক্ত ভাষায় মনের আনন্দ জ্ঞাপন

করিয়া সে শাবকটিকে দুই হাতে চাপড়াইতে লাগিল। এদিকে মেষদল দাসীর পশ্চাতে থাকিয়া গৃহদ্বার বন্ধ দেখিয়া পুনরায় সকলে ফিরিয়া মনোরমার সম্মুখে আসিয়া করুণ-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। শাবকটির মাতা মনোরমার দিকে চাহিয়া ক্রন্দনস্বরে যেন সন্তান প্রার্থনা করিতে লাগিল। শাবকটি মনোরমার আদর উপেক্ষা করিয়া মাতার পানে চাহিয়া চীৎকার করিতেছিল। কামিনী কহিল, "ভাল পাগলামী হচ্চে বৌ-রাণী, ভেড়া-গুলোর চেঁচানিতে কাণ ঝালাপালা হোল যে, আমি তা হ'লে চল্লুম।" মনোরমা হাসিতে হাসিতে শাবকটিকে ছাড়িয়া দিবামাত্র, সে ব্যগ্রভাবে জানালার মধ্য দিয়া নিজেদের দলে লাফাইয়া পড়িল।

১৩

কামিনী মনোরমার চুল বাঁধিয়া দিতেছে। মনোরমা বড় একটা চুল বাঁধিত না, কিন্তু এখানে আসিয়া, কামিনীর হাতে তাহার পরিত্রাণ নাই। কামিনী সেই রেশম-চিক্কণ ভ্রমর-কৃষ্ণ চুলের রাশি সযত্নে বিনাইতে বিনাইতে সৃষ্টি-কর্ত্তার নিপুণ হস্তখানির বার বার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। মনোরমা হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি কবি হ'তে, তা হ'লে আমার চুলের সম্বন্ধে কবিতা লিখে ফেলতে।"

কামিনী বলিল, “সত্যি বৌ-রাণী, আমি যদি দাদাবাবু হ’তাম, তা হ’লে এই চুলের ফাঁসি গলায় লাগিয়ে মরতাম।” কামিনী সন্তোষকে দাদাবাবু বলিত। মনোরমা এ রহস্যের অর্থ না বুঝিয়া কৌতুক অনুভব করিয়া কহিল, “মনে ক’র, তাই হয়েচ, আচ্ছা, ভালবাসলে চুলের ফাঁস গলায় লাগিয়ে কি করে মরতে হয়, আমায় একবার দেখিয়ে দিতে পার?”

কামিনী হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন সময় সন্তোষ আসিয়া যেমন গৃহপ্রবেশ করিবে, কামিনীও উর্দ্ধ-শ্বাসে অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। মনোরমা হাসি চাপিয়া ডাকিল, “আস্তে কামিনী, হোঁচট খেয়ে পড়বে, নয় তো ফুলগাছে আঁচল বাধবে।” সন্তোষ খুসী হইয়া কহিল, “ঠিক বলেছ। উনি যেন রসগোল্লা, আমি যেন দেখিবামাত্র টপ্ ক’রে খেয়ে ফেলব! রকম দেখ না, পালাবার দৌড় কি? আচ্ছা মনোরমা, কামিনী আমায় দেখে অতো লজ্জা করে কেন? তোমার সঙ্গে অতো বন্ধুত্ব, আর আমি বন্ধুরই তো স্বামী?”

মনোরমা একটু গম্ভীরভাবে কহিল, “বৌ মানুষ, পর-পুরুষের সঙ্গে কথা কবে কেন?”

“অবশ্য না কইতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্বস্থলে দোষ কি?”

মনোরমা কহিল, “আমি যদি তার স্বামীর সঙ্গে কথা না বলি, ও কেমন করে তা হ’লে তোমার সঙ্গে কথা বলে?”

সন্তোষ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে ওর তুলনা? তুমি একটা জমীদারের স্ত্রী হয়ে একটা নগণ্য প্রাকটার সঙ্গে কথা বললে আমার মুখ হেঁট হবে না? অথচ আমার সঙ্গে কথা বললে কামিনীর কিছুমাত্র গৌরব হানি হবে না!"

উদ্যত-ফণা ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া মনোরমা কহিল, "সহস্রবার গৌরবের হানি হতে পারে। যারা নারীকে শুধু বিলাসের জিনিষ ব'লে মনে করে, নারীর ব্যক্তিত্ব বা নারীত্বের দিকে সম্ভ্রমের সহিত দৃষ্টিপাত করে না, তাদের সঙ্গে কোনও নারীরই কথা বলা উচিত নয়।" সন্তোষ পূর্ব্বে কোনও দিন মনোরমাকে এরূপ সতেজে কথা কহিতে শোনে নাই, সুতরাং প্রথমে সে একটু স্তম্ভিত হইয়া গেল, পরক্ষণে কহিল, "তোমার বড় স্পর্দ্ধা যে, আমার মুখের ওপর জবাব দিতে শিখচ দেখছি। নিজের ভাল চাও তো মেজাজ ঠাণ্ডা ক'রে থাক, নইলে লাথি মেরে দূর ক'রে দেব।"

সন্তোষ বাহির হইয়া গেল। মনোরমা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে সুদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী পিঞ্জরের ফাঁদ হইতে বাহিরের সুনীল আকাশের দিকে, ঘনচ্ছায়াতরু-শ্রেণীর দিকে যেমন লুব্ধদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, বাহিরের পৃথিবীর দিকে আজ মনোরমা তেমনি করিয়া দৃষ্টিপাত করিল।

আজ তাহার যেন নূতন করিয়া নিজের বন্ধনদশার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। মানুষ যতক্ষণ নিজের বন্দিত্ব বিষয়ে অজ্ঞাত থাকে, ততক্ষণ সে, সে অবস্থা পীড়াদায়ক বলিয়া মনে করে না, কিন্তু জানিবামাত্রই সে দশা অত্যন্ত অসহনীয় বলিয়া মনে হয়। মনোরমার বুকের মধ্যে বেদনার রাশি ফুলিয়া ফুলিয়া তাহার নিশ্বাসকে পর্যন্ত যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, নয়ন কিন্তু অশ্রুশূন্য! মনোরমার মনে পড়িল, কবি গাহিয়াছেন, "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান" আর সে সেই মরণেরই শ্যাম স্নিগ্ধ ক্রোড় পরম রমণীয়, চরম বাঞ্ছনীয় বলিয়া বার বার মনে করিতে লাগিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। মনোরমা চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, সন্তোষ। সে এইমাত্র মদ খাইয়া আসিয়াছে। তাহার চিত্ত প্রফুল্ল, চক্ষু ঈষৎ লাল হইয়াছে। সন্তোষ মনোরমার হাত ধরিয়া টানিয়া খাটের উপর বসাইয়া কহিল, "আমার উপর রাগ করেছ মনোরমা! বল, আমার মাথা খাও।"

মনোরমা হাত টানিয়া লইয়া কহিল, "রাগ কেন করব? রাগ করবার আমার দরকার?" সন্তোষ মনোরমার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "এই তো লক্ষ্মীটির মতন কথা বলছ বাড়ী গিয়ে তোমায় আমি এক জোড়া হীরের নতুন ব্রেসলেট গড়িয়ে দেব।"

মনোরমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্তোষ কহিল, "মনোরমা, আমায় একটা জিনিষ ধার দেবে ?"

"কি জিনিষ ?"

"এই তোমার বালা দু-গাছা। কলকাতায় গিয়েই আমি আবার নতুন গড়িয়ে দেব।"

মনোরমা কহিল, "আমার হীরের বালার দাম প্রায় দু'হাজার টাকা, এত টাকার জিনিষ তুমি কি করবে ? ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞেস না ক'রে আমি দিতে পারিনে, তিনি বার বার ক'রে লিখচেন, যে তাঁকে না জানিয়ে যেন কোনও জিনিষ তোমায় না দিই।"

উত্তেজিত হইয়া সন্তোষ কহিল, "বটে ? জিনিষ আমার, আমি চাইচি, তুমি দাও। তোমার বাপের বাড়ীর জিনিষ তো নয়। তোমার ঠাকুরঝিরও নয়। তাঁর হুকুম বড়, না আমার কথা বড় ?" অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে সন্তোষ পুনরায় কহিল, "মনোরমা, এখানে যে দেনা হয়েচে, তা শোধ না করলে, আমি এ দেশ ছেড়ে যাই কি ক'রে ?"

মনোরমা নিরুত্তরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সন্তোষ কাপড় ধরিয়া টানিয়া কহিল, "কথার জবাব দিয়ে যাও। আমার বড় দরকার, বালাজোড়া দাও, তাতে তোমার ভালই হবে।"

ম্লান হাসি হাসিয়া মনোরমা কহিল, "ভাল আমার সেই দিন হবে, যে দিন আমি মরব।"

সন্তোষ কহিল, "জ্যাঠামি এখন রেখে দাও, বালাটা দাও, দেরী কোর না।"

মনোরমা আঁচল ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "আচ্ছা ঠাকুর-ঝিকে চিঠি লিখি"

"এত বড় স্পর্দ্ধা, দেবে না" বলিয়া সন্তোষ সজোরে মনোরমার দুই হাত হইতে বালা টানিয়া খুলিয়া লইয়া, এমন ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিল যে, হতভাগিনী টেবিলের কোণায় কপাল ঠুকিয়া মেজেতে পড়িয়া গেল। সন্তোষ ফিরিয়াও চাহিল না গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া অন্নপূর্ণা ও পিয়ারীর মা দৌড়িয়া আসিয়া দেখে, মনোরমা মেজেতে লুটাইতেছে. কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া শশব্যস্তে বধূকে কোলে তুলিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

১৪

"মনু, মা কেমন আছ," ক্ষীরোদার স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনোরমা সহসা বিছানায় উঠিয়া বসিল। ক্ষীরোদা খাটের উপর বসিয়া কহিলেন, "থাক মা, উঠতে হ'বে না, শরীর ভাল নেই, একটু বিশ্রাম কর। আজ বিনয়ের ছুটি আছে; তাই একবার তোমায় দেখতে এলুম। তোমরাও তো শীগগির যাচ্ছ, আবার কবে দেখা হয় ঠিক নেই।" ক্ষীরোদা সস্নেহে মনোরমার মাথায় হাত বুলাইয়া আবার

কহিলেন, "মা মনু, দু'টো কথা বলি, মনে কিছু করিস না, শরীরটা পাত ক'রে ফেলেচিস, রং তো কালী হয়ে গেছে। এত ভাবলে দেহ যে মাটী হয়ে যাবে। যেতে তো বসেইচে। তোর মুখ চেয়ে তোর বাপমা বেঁচে আছেন, তাঁদের কথা একটু ভাবিস।"

এমন সময় বিনয় আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। মনোরমাকে দেখিয়া কহিল, "এ কি, ক'দিন আমি আসিনি, এর মধ্যে চেহারা এত শুকিয়ে গেছে। ভিতরে কোনও অসুখ হয়নি তো?"

"ক'দিন থেকে গায়ে বড় ব্যথা হয়ে জ্বরের মতন হচ্চে, তাই জন্যে স্নানাহার করিনি," বেশী কিছু না বলিয়া মনোরমা পিসিমার পায়ের ধুলা লইয়া বিনয়কে প্রণাম করিল।

বিনয় কহিল, "সময়টা ততো ভাল নয়, বিশেষ সাবধানে থেক। আর তোমরা তো যাচ্ছই।"

ক্ষীরোদা কহিলেন, "মনু, শুনলুম, সন্তোষ তোমায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, তাতে তুমি বড় আঘাত পেয়েচ। আমার বোধ হয়, তোমার মন সে জন্য যথেষ্ট তেতো হয়ে গেছে। কিন্তু মা, আমার একটি কথা শোন, মেয়েমানুষের স্বামীর চাইতে বড় দেবতা নেই। সন্তোষ মাতাল, দুশ্চরিত্র, তা জানি, তবু মা তোমার কাছে সে পরম গুরু। তাকে মনে মনে ক্ষমা ক'রে ভালবেস, ভক্তি কোর, তাতেই তোমার ইহ-পরকালের মঙ্গল হবে।"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া, দু'কূল প্লাবিত করিয়া রুদ্ধ স্রোত ছুটিয়া চলিল। মনোরমা এতদিন হৃদয়ের সহিত নীরবে গোপনে যথেষ্ট সংগ্রাম করিয়াছে, আজ পিসিমার প্রাণস্পর্শী সান্ত্বনা-বাক্যে সে আত্মহারা বিবশা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পিসীমা সস্নেহে মনোরমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের নিকট টানিয়া লইয়া বলিলেন, "কচি ফুলের মত হৃদয়ে তুমি যে ব্যথা পাচ্ছ, তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মা তুমি বুদ্ধিমতী, ভেবে দেখ, জগতে সবাই নিজের স্বার্থ দেখে, কিন্তু স্বার্থ বিসর্জ্জন ক'রে যে ভালবাসে, তার মহত্ত্ব কতখানি?"

মনোরমা করুণ-কণ্ঠে কহিল, "পিসীমা, আমায় মাপ করুন। মৃত্যুই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমার মনের বল নেই পিসীমা, আমি আর সহ্য করতে পারি না। মাকেও লিখবেন আমায় যেন ক্ষমা করেন।"

সেই কয়টি করুণ কথা, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মৃত্যু-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদের মত বিনয়ের বক্ষে গিয়া বাজিল। ক্ষণকালের জন্য সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার মনে হইল, বঙ্গ-সংসারের কত রমণীর প্রাণের ভাষা এই করুণ বাণী! বিনয় চেয়ার ছাড়িয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষীরোদা বুঝিলেন, মনোরমার অন্তরে কি সংগ্রাম চলিতেছে। কহিলেন, "দেখ মা, সহ্য করতেই স্ত্রীজাতির জন্ম। হিন্দুর মেয়ে আমরা, কর্ম্মফল মানি। পূর্ব্বজন্মে

অবশ্য কোনও পাপ করেছিলে, যার জন্যে স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হয়েছ। কিন্তু এ জন্মে কর্ম্মের ক্ষয়ে তা লাভ করতে পার। আশায় বুক বাঁধ মা, একদিন তোমার স্বামী তুমি ফিরিয়ে পাবে। আমাদের দেশ সতীর গৌরবে ধন্য, আশীর্ব্বাদ করি মা, সীতা সাবিত্রীর দৃষ্টান্তে তোমার মনে অসীম ধৈর্য্য আসুক।”

বিনয় অসহিষ্ণুভাবে কহিল, “মা তুমি রাগ কোর না, সীতা সাবিত্রীর তুলনা এখানে মা যত অনায়াসে দিচ্ছ, ততো সহজ ব'লে তো আমার মনে হয় না। সত্যবান বা রামচন্দ্রের মতো পতি, নল বা শ্রীবৎসের ন্যায় স্বামী যদি মেয়েরা পায়, সকল দারিদ্র্য, সকল লাঞ্ছনা তা হ'লে তারা অঙ্গের ভূষণ করে নিতে পারে, যে সকল সতী আমাদের দেশে প্রাতঃস্মরণীয়া ও বরণীয়া হয়ে রয়েছেন, স্বামীর প্রণয়ে তাঁরা কোন দিন বঞ্চিতা ছিলেন না, এটা তোমার অবিদিত নেই ?”

মনোরমার অন্তরের অন্তস্তল হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। ঠিক এই কথাই সে-যে কত দিন ভাবিয়াছে। যখনি সে সতী নারীগণের পুণ্যকাহিনী পাঠ করিয়াছে, তখনি সে মনে করিয়াছে, স্বামীর পূর্ণ নির্ম্মল প্রণয় লাভ করিলে অন্তঃকরণে যে অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হয়, সেই অমিতবলের দৃপ্ত চরণতলে জগতের সকল প্রকার অত্যাচার—সকল প্রকার দুঃখ দৈন্য, ধূলার মত গুঁড়া হইয়া যায়।

ক্ষীরোদার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। এই বালিকাকে তিনি আর কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন। তাঁহার নিজের তরুণ জীবনের কথা মনে পড়িল। তাঁহার স্বামীও একদিন উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "মনে কর, তোমায় আমি আর ভালবাসি না, তা হ'লে তুমি কি কর?" এই কথা ক্ষীরোদার বুকে যেন শেলের মত বাজিয়াছিল। কোনও কথার তিনি উত্তর দেন নাই। দুই চক্ষে কিন্তু বাণ ডাকিয়াছিল। মনে মনে বলিয়াছিলেন, যে মুহূর্ত্তে আমি জানিব, স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা করিয়া, সকল জ্বালা জুড়াইব অথচ আজ তিনি স্বচ্ছন্দে, অনাদৃতা উপেক্ষিতা বালিকাকে আদর্শ সতী নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন; তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "বড় মানুষের ছেলে সঙ্গদোষে অনেকেই এ রকম বিগড়ে যায়, আবার শুধরে যাবে। তুমি কিছু ভেব না মনু, কলকাতায় গিয়ে মা বাপের কাছে গেলে তোমারও মনটা ভাল থাকবে। যাচ্চ, ভালই হচ্চে। সদা সর্ব্বদা চিঠি পত্র লিখ মা।"

বিনয় দুই বাহু নিজের প্রশস্ত বক্ষে বাঁধিয়া, নতমুখে গৃহের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে লাগিল। গৃহ নীরব, কাহারও মুখে কথা নাই। কতক্ষণ পরে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বিনয় কহিল, "মা, তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, যত দিন

বাঁচব, যত দিন দেহে রক্তবিন্দু থাকিবে, নারীজাতির কল্যাণ সাধনই প্রাণপণে করতে চেষ্টা করব। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, আশ্রিতের প্রতি এই কঠোর নির্য্যাতন যতটুকু দূর করতে পারি তার চেষ্টাই আমার ব্রত রইল।”

বিনয় মাতার পদধূলি গ্রহণ করিল, ক্ষীরোদা সস্নেহে পুত্রের ললাট চুম্বন করিলেন। ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণ গৃহমধ্যে আসিয়া, এই দৃশ্য দেখিলেন। এ পবিত্র দৃশ্যে তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইল, নয়নপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, মনোরমারও দুইটি নয়ন সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে আরতির যুগল-প্রদীপের মত জ্বলিয়া উঠিল।

১৫

স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্র কিরণে চারিদিক্ ঝল-মল করিতেছে। মনোরমার রক্তিম কপোলে, নিটোল মুক্তার মত অশ্রু-বিন্দুগুলি সেই উজ্জ্বল-কিরণ-সম্পাতে সমধিক উজ্জ্বল দেখাই-তেছে। মিস্ বুরেশ মনোরমার কটি বেষ্টন করিয়া সস্নেহে কহিলেন, “মনোরমা, প্রভুর প্রেম স্মরণ ক’রে নিজের দুঃখ বিস্মৃত হও। আমি জানি, তোমরা আত্ম-হত্যাকে বড় সহজেই বরণ কর, কিন্তু সে কাজ কোর না, তোমার জীবন, জীবন দাতারই কাজে উৎসর্গ কর।

এস আমার সঙ্গে, আমি তোমায় ভগ্নীর মতন ভালবাসি, তোমার মনোবেদনা আমার অন্তঃকরণে বড় বাজছে, মনোরমা—"

মনোরমা কাতরকণ্ঠে কহিল, "আপনার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ! আবার এ জীবনে দেখা হবে কি না জানি না। আমি আপনাকে সদা সর্ব্বদা চিঠি লিখব, আপনিও অবশ্য লিখবেন। হয় তো কখনও আপনার নিকট আমি আসতেও পারি।" কথাটা বলিয়াই মনোরমার স্মরণ হইল, সেই না নিজে একদিন বিনয়ের কাছে বলিয়াছিল, সুযোগ পাইলে মেয়েরা প্রচারিকাদের দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, এখন সে কি না নিজেই উহা গ্রহণ করিবার আভাস জানাইতেছে। মনোরমার তখন মনে পড়িল, মানুষের বোধ বা বিচারশক্তি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিয়তই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু উহা অস্বাভাবিক নয়। সে জন্য মানুষের চিত্তকে চঞ্চল বা অস্থির বলিয়া দোষারোপ করা চলে না।

মিস্ বুরেশ একখানি মরক্কো বাঁধাই, শুভ্র বাইবেল পুস্তক মনোরমার হাতে দিয়া কহিলেন, "আমার প্রীতি-নিদর্শন এই পুস্তক তোমার হাতে দিচ্চি, তুমি ইহা অনুরাগের সহিত পাঠ কোর। আমি প্রভুর নিকট সর্ব্বদাই তোমার আত্মার উন্নতির জন্য, কল্যাণ প্রার্থনা করব। কলিকাতায় আমি গ্রীষ্মাবকাশে যাব মনে করেছি, সেই সময় আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

মনোরমা ধন্যবাদ জানাইয়া নিজের অঙ্গুলি হইতে একটি হীরকখচিত আংটি খুলিয়া মিস্ বুরেশের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল। মিস্ অপ্রতিভভাবে কহিলেন, "মূল্যবান্ জিনিষ আমায় কেন দিচ্চ ভগ্নি! আমি বড় লজ্জিত হচ্চি।"

মনোরমা কুমারীর হাতখানি চুম্বন করিয়া কহিল, "কিসের লজ্জা! আপনি আমায় ছোট ভগ্নীর মতন মনে করবেন। আমার উপহার অতি সামান্য, কিন্তু আমার প্রাণ-পূর্ণ স্নেহ দ্বারা ঐটি আপনার স্নেহের চক্ষে অবশ্য অসামান্য বলেই মনে হবে।"

"নিশ্চয়" বলিয়া কুমারীও মনোরমার কপোলে চুম্বন করিলেন। যেন দু'টি গোলাপ সংযুক্ত হইল। কুমারী বিদায় লইলেন। এই সময় খোকাকে কোলে লইয়া কামিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

খোকার হাতে একটি অতি সুন্দর ফুলের তোড়া। কামিনী গৃহে প্রবেশ করিয়াই খোকাকে কহিল, "মাসী-মার হাতে ফুল দাও খোকা।" খোকা কিন্তু অসম্মতিসূচক চীৎকার করিয়া দুই হাতে তোড়ার ফুলগুলি চাপিয়া ধরিল। কামিনী ফুলগুলিকে শ্রীহীন ও বৃন্ত-ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম দেখিয়া দুঃখে ও বিরক্তিতে খোকাকে তিরস্কার করিল। সে আজ কত যত্নের সহিত এই ফুলগুলি সংগ্রহ করিয়া তোড়া বাঁধিয়া আনিয়াছে; তাহার যত্নের উপহার সামগ্রী দুষ্ট শিশুর হস্তে নষ্ট হয় দেখিয়া সে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে

গেল। মনোরমা হাসিয়া কহিল; "কামিনী, টানাটানিতে ফুলগুলি নষ্ট হবে, আমি ভুলিয়ে নিচ্চি, খোকাকে কাঁদিও না।"

মনোরমা নিজের কণ্ঠ হইতে হার ছড়াটি খুলিয়া খোকার সামনে ধরিল। খোকা সহজেই নূতন জিনিষটির প্রতি আকৃষ্ট হইল। কামিনী খোকার শিথিল মুষ্টি হইতে ফুলের তোড়াটি লইয়া মনোরমার হাতে দিল। মনোরমা খোকার গলায় হার ছড়াটি পরাইয়া দিয়া কহিল, "কামিনী, খোকাকে আমি এই হার দিলাম, যখন খোকা বড় হবে, আমার কথা ওকে বোল।" মনোরমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, মনোরমা খোকাকে বুকে চাপিয়া চুম্বন করিল।

কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কাল তোমরা চলে যাবে, আমার বুক যেন ভেঙে যাচ্ছে। আমি মা বোন জানি না, তোমাকে আমি বড় বোনের মতন পেয়ে-ছিলাম, কেমন ক'রে আমি থাকব।" মনোরমা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মনের সুখে থাক, স্বামী পুত্র নিয়ে ঘরকন্না কর, প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হলেও দু'দিন পরে সয়ে যাবে, আমি কিন্তু তোমাদের নিয়ে প্রবাসে ছিলাম, এই স্মৃতিই আমাকে আবার ব্যথার মধ্যে আনন্দ দেবে। যেখানেই থাকি, তোমাদের জন্য সর্ব্বদাই আমি ভগবানের কল্যাণ কামনা করব।"

কামিনী কহিল, "বৌরাণী, আপনি অতো দামী সোণার

হার আমাদের দেবেন না, আমরা গরীব, আমাদের ও শোভা পাবে না। আপনার শ্বাশুড়ী জানলে, রাগ করতে পারেন, উনিও বকবেন।” মনোরমা কহিল, “সে ভার আমার। কত মূল্যবান্ গহনা আমি স্বামীর বিলাস-বাসনা চরিতার্থের জন্য খুলে দিচ্ছি। আর এক ছড়া হার আমি যেখানে প্রাণ থেকে উপহার দিয়ে প্রীতি পাচ্ছি, তা দেবার আমার অধিকার নেই? তোমার স্বামীকে আমার নাম ক’রে বোল, এতে তাঁর বকবার কোনও কারণ নেই।”

এমন সময় চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া একদল বালিকা গাহিয়া উঠিল,—

শ্যামলিয়া!
ঝুলন ঝুলত রাজকুমারীয়া—
নাচত বোলত,
সখী সব আওত
হিলতে ডোলতে রাধাপিয়ারীয়া
শ্যামলিয়া!

মনোরমা জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখে সুবৃহৎ অশ্বত্থগাছে একটি দড়ির দোলনা টাঙান ছিল, মাঝে মাঝে একদল মেয়ে আসিয়া দোল খাইত, একজন করিয়া দোলনায় উঠিত, একজন তাহাকে দোল দিত, অপর সকলে সমস্বরে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্র ভাষায় গান

করিত, মনোরমা সে দৃশ্যে পরম কৌতুক অনুভব করিত। গানের দুই এক ছত্র বুঝিতে পারিত মাত্র, কিন্তু সুরটুকু তাহার ভাল লাগিত।

১৬

কোথায় সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, আর কোথায় বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর। দুই দেশের মধ্যে কত শত ক্রোশ ব্যবধান। কিন্তু রেল কোম্পানীর কৃপায় তিন দিনেই সন্তোষ পত্নী ও মাতা সহ বহরমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যদিও কলিকাতা আসিবার জন্য সন্তোষ (অবশ্য অনিচ্ছায়, যেহেতু ভগ্নীর শাসনাধীনে আসিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না) জব্বলপুর হইতে রওনা হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে অন্যরূপ ঘটিল। এলাহাবাদ ষ্টেশনে একটি ভদ্রলোকের সহিত তাহার আলাপ হইল, তাঁহার নাম হরকুমার মুখোপাধ্যায়। নিবাস মুর্শিদাবাদ, কিন্তু ভ্রমণ সর্ব্বস্থানে—বিশেষতঃ বড়-লোকের ছেলেদের সহিত আলাপ হইলেই তাহাদের তত্ত্বাব-ধান লইতে তিনি বড়ই তৎপর। সন্তোষের সঙ্গে আলাপ হইবামাত্র চতুর হরকুমার যেন তাহার চরিত্রটি পাঠ করিয়া লইলেন। হরকুমার সুগায়ক, গানে তিনি মজলিস জাঁকাইয়া তুলিতে পারেন বলিয়া অনেক বড়লোকের

সভায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। অনেকে তাঁহাকে মোটা মাহিনা দিয়াও গান শেখেন।

গাড়ীতে দু' চারিটি গান গাহিয়া তিনি সন্তোষকে মুগ্ধ করিলেন। সন্তোষও সঙ্গীতানুরাগী, সে হরকুমারকে ধরিয়া বসিল, "আপনি আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় চলুন।" হরকুমার কহিলেন, "উপস্থিত তো যেতে পারব না, তবে কলিকাতায় আমার প্রায় যাওয়া আসা আছে। আপনি তো বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন, বরং যাবার মুখে আমাদের বহরমপুরটা একবার বেড়িয়ে যাবেন চলুন। এমন pleasant জায়গা, এমন scenery যে, আপনি দেখলে বড়ই খুসী হবেন। সুদূর পশ্চিমে এত বেড়িয়ে এলেন, আর আপনার ঘরের পাশে সুজলাং সুফলাং শস্য-শ্যামলা-বাঙ্গলা মায়ের ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি চেয়ে দেখলেন না, সত্যি বলছি সন্তোষবাবু, অনেক দেশ বেড়াই, কিন্তু কবিরা যাকে সোণার বাংলা বলেন, তেমন চমৎকার দেশটি আর কোথাও দেখলুম না।—ভাবাবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হরকুমার গাহিয়া উঠিলেন,—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—
আমার জন্মভূমি, সে যে আমার বঙ্গভূমি,"

রেলের কর্কশ ঘর্ঘর কর্ণদাহী নিনাদকে ছাপাইয়া হরকুমারের মধুর উচ্চ স্বর আকাশপথে ছুটিয়া চলিল। স্তব্ধ মুগ্ধ সন্তোষ বিস্মিত প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া

রহিল। পাশের গাড়ীর যাত্রীরা সাগ্রহে ঝুঁকিয়া গায়ককে দেখিবার জন্য কেহ বা সফল কেহ বা ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

সন্তোষের মন ছুটিল বহরমপুরের দিকে, অন্নপূর্ণাও পুত্রের অনুরোধে সহজেই সম্মতা হইলেন। মনোরমাও তাহাই চায়। কলিকাতায় পিতামাতার নিকট ফিরিতে তাহার মোটেই আগ্রহ নাই। বরং কলিকাতায় ফিরিবার চিন্তায় তাহার চিত্ত অধিকতর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন যেন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সন্তোষ মোকামায় আসিয়া ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিয়া লুপ মেলে উঠিল। হরকুমার পরমাত্মীয়ের ন্যায় সকলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। দরোয়ান কালী সিংও সন্তোষের অনর্থক বকুনিগুলার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া হাঁফ ছাড়িল।

রামপুরহাটে আসিয়া পুনরায় গাড়ী বদলাইয়া আজিম-গঞ্জের ট্রেণে উঠিতে হইল। আজিমগঞ্জে নামিবামাত্র একটি রূপবান্ সুসজ্জিত তরুণ যুবক হরকুমারকে দেখিয়া সাগ্রহে কহিল, "মাষ্টার যে, হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। আমরা ভেবেই অস্থির। কোথেকে আসছেন বলুন দেখি, যাবেনই বা কতদূর? চলুন আমাদের বাসায়।"

হরকুমার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আর দাদা, তোমরা যে বাতাসকে ধরে রাখতে চাও দেখছি,

এখন শোন, জরুরি কথা আছে।” হরকুমার হীরালালের কাণে কাণে কি কতগুলি কথা বলিল, হীরালাল প্রীতি-প্রফুল্লমুখে অগ্রসর হইয়া সন্তোষের করমর্দ্দন করিয়া কহিল, “ষ্টেশনের নিকটেই আমার একখানি খালি বাংলো আছে; এ বেলা অনুগ্রহ করে সেখানে বিশ্রাম ও আহারাদি করবেন চলুন। কাল না হয় বহরমপুর যাবেন। আসুন মাষ্টার, সবাইকে নিয়ে আসুন।” সন্তোষ পরম আপ্যায়িত হইয়া নূতন বাসাভিমুখী হইল। আগে আগে চলিল হর-কুমার, মধ্যে অন্নপূর্ণা সন্তোষ ও মনোরমা, পশ্চাতে কালী সিং ও হীরালাল।

মনোরমার সুঠাম অর্দ্ধাবৃত বাহু দু'টি ও সুন্দর পদপল্লব দু'খানির অপূর্ব্ব নিক্ষেপ ভঙ্গিমা দেখিয়া হীরালাল মনে মনে কহিল, “একি! সুন্দর! বিদ্যুৎকে যেন ধরে রাখা হয়েছে। যার পা ও হাত এত সুন্দর, না জানি তার মুখখানি আরও কত সুন্দর। অতৃপ্তনয়নে হীরালাল মনোরমার গমনশীল মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিতে চাহিতে পথ চলিতে লাগিল।

১৭

বহরমপুরের নূতন বাঙ্গলায় আসিয়া সকলেই খুব খুসী হইল। মনোরমার মন যেন নবোৎসাহে নাচিয়া উঠিল, বড় সুন্দর স্থান, গঙ্গার ধারেই বাংলো, চারিদিকে ফল ও

ফুলের বাগান। বিলাতী লতাগুলি গৃহের দেওয়াল বাহিয়া উঠিয়াছে, ঠিক যেন কুঞ্জ-ভবন। নানাবিধ বিলাতী সিজ'নফ্লাওয়া'রএর শয্যাগুলি নব নব সৌন্দর্য্যে দর্শকের নয়ন মন আকৃষ্ট করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গোপাল যুঁই মল্লিকার সারি। একদিকে একটি মালতী ফুলের সুবৃহৎ মঞ্চ ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। ফুলের গন্ধ বায়ুভরে বহুদুর পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের মনে স্নিগ্ধ উন্মাদনার আবেশ ঢালিয়া দিতেছে। সন্তোষ, হীরালালকে বার বার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতে লাগিল। ভাগ্যে সে বুদ্ধিমানের মত হরকুমারের পরামর্শ শুনিয়া এখানে আসিল, নচেৎ এ সৌন্দর্য্য সম্ভোগের সুযোগ ঘটিত না।

সন্তোষের প্রথমা পত্নীর সই কমলা পাশের বাংলোতেই বাস করিত, কমলার স্বামী খগেন্দ্রের সহিত সন্তোষের পরিচয় ছিল, খগেন্দ্রনাথ বহরমপুরে ওকালতী করেন এবং অবসর সময়ে মাসিক পত্রে কবিতা ও গল্প লিখিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় বিমল আনন্দে কালযাপন করেন। কমলা দু'চারি দিনেই মনোরমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল। উভয় পরিবারে যাওয়া আসা চলিতে লাগিল। খগেন্দ্র একদিন সন্তোষকে কহিলেন, "হীরালালের সহিত বুঝে শুনে চোল ভায়া, ওর স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, কৈঁইয়ারা এ অঞ্চলে যেমন ধনী, তেমনি আবার অনেকের চরিত্র

ভাল না। মাষ্টার হরকুমার গান বাজনায় ওস্তাদ; কিন্তু চরিত্রে বড় লঘু। তুমি ভাই নূতন এসেছ, তোমায় আমার সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত বলে এ কথা বললুম।"

সন্তোষ হাসিয়া কহিল, "ভালই করলেন খগেন বাবু, কিন্তু সাবধান করে দেওয়াটা মেয়েদের জন্মই আবশ্যক; পুরুষমানুষের আর সাবধান হওয়ার কি আছে?" সন্তোষের চরিত্রে বড় দুর্ব্বল ইহা খগেন্দ্র জানিতেন। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া তিনি কৌতূহলী হইয়া কহিলেন, "বলেন কি সন্তোষবাবু, সঙ্গ দোষ বা গুণের যে একটা খুব প্রভাব আছে, তা কি আপনি অস্বীকার করতে চান?"

'কখনই না' বলিয়া সন্তোষ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "দেখুন, মাটীর বা কাঁচের বাসনগুলির ভাংবার ভয় বড় বেশী, সেগুলিই সাবধান ক'রে রাখতে হয়। একটুকুতেই ভেঙে যাবার—এমন কি ছুঁলেও নষ্ট হবার পর্য্যন্ত ভয় আছে। কিন্তু সোণা রূপার জিনিসের সে ভয় নেই। ভাংবেও না, ছোঁয়া পড়ে ব্যবহারের অযোগ্যও হবে না।"

খগেন্দ্র অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "আপনার তো বেশ প্রতিভা আছে দেখছি, উপমাটি বেশ দিয়েছেন তো, কিন্তু আপনি কি মেয়েদের মাটী ও কাচের দরে ফেলে পুরুষদের সোণার দরে ফেলতে চান?"

সন্তোষ কহিল, "আমি একা কেন ফেলব? পৃথিবী শুদ্ধ লোকই যে এই দর ক'ষে স্থির করেছে! ভগবান্

যিনি—নরনারীর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই নিজে এই দর করেছেন।”

খগেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্তোষ পুনরায় কহিল, “আপনি যে অবাক্ হলেন, খগেন বাবু, আপনার মত লেখক বলে খ্যাতি না থাকলেও তর্কে আমাকে হারাতে পারবেন না।”

খগেন্দ্র কহিলেন, “আপনি কি এটা স্বীকার করেন না যে, পুরুষরা যদি অসংযম, ব্যভিচার প্রভৃতি চরিত্রদোষে দূষিত হয়, তা হ'লে সে দোষ সংক্রামকরূপে মেয়েদেরও মনকে কলুষিত এবং সংসারকেও অপবিত্র ও অশান্তির আলয় কোরে ফেলে?”

সন্তোষ দক্ষিণ বাহু সঞ্চালন করিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, “আমি তা কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যদি নিজের সখ্ চরিতার্থ করি, তা বলে আমার বাড়ীর মেয়েদের পবিত্রতা নষ্ট হবে তার কোন মানে নেই। আপনি বলবেন অনেক বাড়ীতে তা হয়, কিন্তু পুরুষরা যদি বুদ্ধিমান্ হয়, তা হ'লে তাদের তীক্ষ্নদৃষ্টির বলে কিছুই লুকোতে পারে না। যারা আমাদের সাহায্যের মুখ চেয়ে বেঁচে থাকে, আমাদের ভিন্ন যাদের গতি নেই, আমরা যাদের ভরণপোষণ-কর্ত্তা, আশ্রয়দাতা, প্রতিপালক, রক্ষক, তারা কি আমাদের সঙ্গে সমানে চল্‌তে সাহস করতে পারে? অসম্ভব! এই দেখুন না, মেয়েরা বিধবা হবার চাইতে

নিজের মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ মনে করে, এইতেই আমাদের ও তাদের মধ্যে উচ্চ নীচ ভাবটা বুঝে নিন। হা-হা-হা—ঠিক বলেছি, না, খগেন বাবু, আচ্ছা,—আমার একটা কাজ আছে, এখন চল্‌লুম, সইকে আমাদের বাসায় যেতে বল্‌বেন।"

সন্তোষ চলিয়া গেল। খগেন্দ্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সন্তোষ বড় মন্দ বলে নাই, অনেক সুশিক্ষিত লোকের মনের ভাবই সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। মুখে যে যতই বলুক কিংবা তর্কের দ্বারা যতই সন্তোষের কথা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করুক না কেন, সমস্ত লোকের কিন্তু ঐ মত, কার্য্যের দ্বারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

১৮

অন্নপূর্ণা প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে পূজার ফুল তুলিয়া দুই ঘণ্টা কাল পূজায় অতিবাহিত করেন। বধূর মলিন মুখখানি তাঁহার প্রাণে বড়ই ব্যথা দেয়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কিছুই প্রকাশ করেন না। একান্তমনে ইষ্টদেবতার চরণে শুধু পুত্রের মতি পরিবর্ত্তনের জন্ম প্রার্থনা করেন। তাঁহার এ কাতর প্রার্থনা কি এক দিনও সে উদাসীন কঠোর ভাগ্যদেবতার চরণে পৌঁছিয়া তাঁহার আসন টলাইতে পারিবে না? সন্তোষকেও তিনি

অযত্ন করেন না। আহারের সময় নিজে সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করেন, জলখাবারের থালা নিজে সাজাইয়া দেন, কিন্তু সন্তোষ স্নেহময়ী মাতার সহিত একদিনও অনুরক্ত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করে না। মনোরমাকেও অন্নপূর্ণা অত্যন্ত যত্ন করেন, কিন্তু হইলে কি হয়, মনোরমার স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কমলা একদিন অন্নপূর্ণাকে গোপনে কহিল, "মা, মনোরমার চেহারা বড় খারাপ হয়ে গেছে, ওকে একবার ডাক্তার দেখানো ভাল। ভিতরে কোনও রোগই বা হয়েছে!" অন্নপূর্ণার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, কহিলেন, "কি করি মা, সবই আমার অদৃষ্ট। বৌমার বাবা লিখেছেন তিনি মেয়েকে নিয়ে যাবেন। আমিও তো পাঠাতে চাই, বৌমা যে যেতে চায় না।"

কমলা কোনও কথা না বলিয়া মনোরমার গৃহে আসিল। মনোরমা উদাস দৃষ্টিতে জানালার পথে চাহিয়াছিল। গঙ্গার বুকে কত খালি ও বোঝাই নৌকা চলিয়াছে, সে বুঝি ভাবিতেছিল, তাহার জীবন-তরণী ঐ খালি নৌকার ন্যায় যেন লক্ষ্যহীন অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ভাসিয়াই চলিয়াছে, সে তরী কাণ্ডারীশূন্য, কূলে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যবিহীন। কমলা আসিয়া স্নেহাপ্লুত-কণ্ঠে ডাকিল, 'সই'! মনোরমা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, মৃদু হাসির প্রভায় তাহার ঠোঁট দু'খানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেও ডাকিল, "সই দিদি, খুকী কই?"

"সে এখন ঘুমুচ্চে, তুমি একলাটি বসে কি করচ?

আমাদের বাসায় যাও নি কেন ? আমি আবার এলুম।"

কমলা মনোরমার পাশে বসিয়া পড়িল। দুই জনে এ-কথা, সে-কথা কিছুক্ষণ হইবার পর কমলা কহিল, "তোমার চেহারাটা বড় খারাপ হ'য়ে যাচ্চে সই! ভিতরে কিছু অসুখ হয়-নি তো ?"

মনোরমা কহিল, "কোনও অসুখ তো বুঝি না, কেবল বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে যেন একটু কন্ কন্ ক'রে উঠে—সে কিছু না।"

কমলা মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া, সস্নেহে মনোরমার একরাশ বেলফুলের মত কোমল হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করি সই, কিছু মনে কোর না। আমার সে সই তো এখন একে-বারে বদ্‌লে গেছে, সন্তোষ বাবুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মুছে ফেলেছে। তাতে তাকে বড় দুঃখিত বোলেও মনে হয় না। মনে করেছিলুম, সন্তোষ বাবুর স্বভাব তোমার সঙ্গে ঘর কোরে শুধরে যাবে, তারও তো লক্ষণ দেখি না। তা তুমিও কি তাকে এলে দিয়েছ ? শোধরাবার চেষ্টা কিছু কোরছ না ? লজ্জা কোর না সই, মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের কাছে লজ্জা কি ভাই ?"

মনোরমা হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে তার নিটোল গোলাপী গাল দু'টি ও বিশাল চক্ষু দু'টি উজ্জ্বল না হইয়া যেন কিসের ছায়ায় মলিন দেখাইতে লাগিল। মনোরমা

কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "সই দিদি, নিজের ভাব নিজেই কিছু বুঝতে পারিনে, তা তোমায় কি বুঝিয়ে বোলব ? স্বামীর ভালবাসা কি জিনিষ—সে ভালবাসার প্রতি স্ত্রীলোকের কতটা দাবী, কতটুকু অধিকারের সীমা তা তো আজো বুঝলুম না। শুধু এইটুকু বুঝছি, বুকের ভিতর কি যেন একটা অতৃপ্তি—কি যেন একটা অশান্তি জমাট হয়ে উঠছে। জীবনটা একটা ভারী বোঝার মত হোচ্ছে। এ বোঝা মাথায় নিয়ে চলবার সামর্থ্য দিন দিন কমে যাচ্ছে. এর বেশী আর কিছু বলতে পারি নে সই।"

মনোরমার স্বরে এমন একটা নৈরাশ্যভাব ফুটিয়া উঠিল, যাহা কমলার নারী-হৃদয়ের সমগ্র সহানুভূতিকে অতি নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিল। মনোরমার মাথাটি বুকের নিকটে টানিয়া কমলা কহিল, "সই, একটা কথা তো বল্‌লে না ? সন্তোষ বাবুকে তুমি ভালবাস কি না—তাই যে আমি জান্‌তে চাই। তুমি যদি তাঁকে প্রাণ ঢেলে ভালবাস, তাঁর জন্য সতীকুলশিরোমণি ভগবতীর চরণে অহোরাত্র প্রার্থনা কর, তা হ'লে একদিন তাঁকে ফিরতেই হবে, একদিন তিনি এসে বলবেনই, 'আমি তোমারি, আর কারু নয়।' প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে জয় করতে হবে, আমরা মেয়েমানুষ, কাঁদতে, সহ্য করতেই আমাদের জন্ম। যতটুকু আমরা পাই তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।"

মনোরমা মাথা তুলিয়া দৃপ্ত-ভঙ্গীতে কহিল, "রাগ কোর

না সই দিদি, তোমার ও শিক্ষা আমি মাথা পেতে স্বীকার করতে পারছি না। আমিও অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমার মন ঠিক ঐ কথায় কিছুতে সায় দিতে চায় না। যে আমায় খেলার পুতুল বোলে মনে করে, দাসীর অধম বোলে ইচ্ছা মত একটু আধটু ভালবাসা দিতে চায়, তাকে আমি শ্রদ্ধা ভালবাসা দিতে পারি না। সত্যি বটে, আমরা মেয়েমানুষ, সহিতেই—কাঁদতেই আমাদের জন্ম, কিন্তু এটাই কি ঠিক ভগবানের বিধান, না মানুষের মনগড়া নিয়ম ?”

কমলা কহিল, “আমরা দাসী বৈ কি বোন্। কিন্তু এ দাসত্বে কত গৌরব, কত আনন্দ বল দেখি ? এ সেবার আনন্দে—”

বাধা দিয়া মনোরমা কহিল, “দাসী বোলে জোর করে যার কাছ থেকে দাসীপনাটুকু কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে যাওয়া যায়, তার কাছ থেকে প্রাণের জিনিষ কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু তাকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে প্রীতির চোখে দেখলে, সে, দাসীর চাইতে ঢের বেশী, তার যথা-সর্ব্বস্ব, তার সমস্ত জীবন দিয়ে সেবা করতে পারে, এটা কি ভেবে দেখেছ দিদি ?”

কমলা আর কিছু বলিল না। কমলার দাসী আসিয়া ডাকিল, “মা, বাবু এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন।” কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল, মনোরমাকে কহিল, “আমাদের বাসায় একবার যেয়ো ভাই।”

কমলা দাসীর সঙ্গে বাসায় আসিল, খগেন্দ্র কহিল, "বেড়াতে গিয়েছিলে? মনোরমা কেমন আছে? সে তো কই একদিনও আসে না?"

কমলা কহিল, "তাঁর প্রাণে যে আগুন জ্বলচে।"

"তা নিবিয়ে ফেলবার চেষ্টা করচ না, বসে বসে দেখছ শুধু। তুমি তবে তার কাছে যাও কেন? তোমারও তো কাপড় ধোরে যেতে পারে!"

কমলা কহিল, "ইস্! আমার কাপড় ধোরবে কেন? আমি অত অসাবধানী নই, আমি চেষ্টা করছি, যাতে নিভে যায়। কিন্তু সইদের দু'জনই সমান। সই বলে, যে আমায় চায় না, তাকে আমি ভালবাসতে পারি না, তার মুখ চেয়ে বসে থাকা সে অনর্থক মনে করে। মেয়েমানুষের এ তেজ এ দম্ভ ভাল কি?"

খগেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "কেন ভাল নয়? সেও তো ভগবানের সৃষ্ট জীব, পুরুষের মত তারও তো মান, অভিমান, সুখ দুঃখ বোধ আছে?"

কমলা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "বেশ বুদ্ধি আর কি? মেয়েমানুষের ভালবাসার জোরে, ভক্তির জোরে, পুরুষ যেমন হোক্, বশ যে হোতেই হবে। তা নয়, সে যদি আমায় না চায়, আমি তবে হাল ছেড়ে দিয়ে বোসে থাকব।"

খগেন্দ্র গম্ভীরভাবে কহিল, "তোমরা তুচ্ছ নারী জাত্—দশহাত কাপড়ে তোমাদের কাছা নেই, তোমাদের

আবার ভালবাসার তেজ কি? আমাদের ভালবাসা ও অনুগ্রহ ভিন্ন তোমাদের গতি কৈ? আমরা যদি ইচ্ছা কোরে তোমাদের দিকে ফিরে চাই, সে তোমাদের পরম সৌভাগ্য, নইলে তোমাদের ভালবাসার বা ভক্তির বিশেষত্ব তো কিছু আমি দেখি না। আমাদের খুসী হয়, ফিরে চাইতে পারি, না খুসী হয়, ফিরে চাইব না, কিন্তু তোমায় আমার পথ চেয়ে থাকতেই হবে, তা ভিন্ন তোমার আর জগৎ সংসারে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কিছু নেই।"

কমলার চক্ষু স্থির হইল, স্বামীর মুখে সে এমন গর্ব্বিত ও উদ্ধত কথা কখনো শোনে নাই, বরং মনে মনে কমলার যথেষ্ট গৌরব ও আত্ম-প্রসাদ ছিল, এমন স্বামীর প্রায় কোনও নারীর ভাগ্যে সহজে ঘটে না, স্বামীর ষোল আনা মন এতখানি অধিকার করিয়া বসা সাতজন্ম শিব-পূজার ফল। কমলার বিশ্বাস, তাহার ভালবাসার গুণে তাহার স্বামী এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন, আজ খগেন্দ্রের কথাগুলি কাঁটার মত তাহার বক্ষে গিয়া বিঁধিল, দৃপ্ত রসনা একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। কমলার দুই চক্ষে শতধারা ছুটিল। খগেন্দ্র মুহূর্ত্তের রহস্যে হিতে বিপরীত ঘটিল দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন।

১৯

দ্বিপ্রহরের সময় বাগানের মালতীমঞ্চের ছায়ায় মনোরমা অনেকক্ষণ একা বসিয়াছিল, সুদূর দিগন্তের নীলিমায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কত কথাই সে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া ধীরপদে নিজের ঘরে আসিবামাত্র দেখি ', তাহার নবনিযুক্তা দাসী শৈল, বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনোরমার ব্যবহৃত "সুগন্ধি তৈল" ও চিরুণী লইয়া নিজের প্রসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছে। মনোরমা দাসীর স্পর্দ্ধা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাবিল, আহা. ওদেরও তো প্রাণ আছে, সখই বা না থাকিবে কেন? তাই কোমলকণ্ঠে কহিল, "শৈল, আমার চিরুণী দিয়ে মাথা অাঁচড়াচ্ছিস্ কেন? তোদের মাথায় উকুন থাকে, সে-গুলো এসে আমার মাথায় ঢুকবে। ও চিরুণী তুই নে, আমি অন্য চিরুণীতে মাথা অাঁচড়াবো।"

শৈল অপ্রতিভ হইল, কিন্তু সে খুব চতুর, কহিল, "মাপ কর বৌ দিদি, আর আপনার চিরুণীতে হাত দেবো না। আসুন, আপনার চুল বেঁধে দিই, আমি অনেক রকম চুল বাঁধতে জানি "

"রকমারীর দরকার নেই, একটু আঁচড়ে দিস্ তো দে।" শৈল মনোরমার চুলগুলির সংস্কারে মন দিল। সেই আগুলফলম্বিত ঘনকৃষ্ণবর্ণ মাথাভরা চুলগুলি যত্নাভাবে

প্রায়ই জটা বাঁধিয়া থাকিত। শৈল সেগুলি ছাড়াইয়া দিতে দিতে কহিল, "আপনি চুলের যত্ন করেন না কেন বৌ-দিদি? এত চুল কি সবার হয়?" মনে মনে কহিল, "হে ঠাকুর, তোমার কাছে কি মানসিক করলে এমন গা-ভরা রূপ আর মাথা-ভরা চুল পেতে পারি?"

মনোরমা কহিল, "আগে কোথা কাজ করতিস্ শৈল?" শৈল কহিল, "কেন বৌদিদি, সে দিন যে বোল্লাম, হীরালাল বাবুর বাড়ী। তাঁদের বাড়ী এই যে কাছেই। ওঁরা খুব বড় লোক। ঘিয়ের কারবার, হুণ্ডীর কারবার। এদেশে কেঁইয়ারা খুব ধনী। ওদের বাড়ী ছালায় (থলে) ভরা টাকা আসে, সে বাঁটখারায় করে ওজন করে। মেয়েরা সব খুব সুন্দরী, কিন্তু কি মজা, হীরালাল বাবুর স্ত্রী বাবুর চাইতে ঢের বড়, হি, হি, হি!"

মনোরমার কাণে এ কথা নূতন ও বিচিত্র বোধ হওয়ায় সে কৌতূহলী হইয়া কহিল, "ও রকম বিয়ে ওদের চলে না-কি?"

শৈল উৎসাহের সহিত কহিল, "খুব চলে। ওরা সব মাছ খায় না, কোন জীবের প্রাণ বধ করে না। আমার কাজ ছিল সকালে উঠে বহুজীর বিছানা থেকে ছারপোকাগুলি বেছে রূপার একটি কৌটায় ভরে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসা। একটি পিঁপড়ে পর্য্যন্ত মারতে দেয় না, এমন কি, রাত্রি হবার আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে ন্যায়, যদি রাতে

খাবার সময় অন্ধকারে কোন পোকার জীবনহানি ঘটে।"

মনোরমা বাঙালীর সাংসারিক জীবন ভিন্ন অন্য কোন জাতির আচার ব্যবহার বিষয়ে কিছুই জানিত না, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আরও জানিতে তাহার বিশেষ আগ্রহ হইল। মনোরমা কহিল, "তোকে কি কি কাজ করতে হোতো?"

"কেবল বহুজীর কাছে থাক্‌তাম, তার বিছানা করা, সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া, চুল বাঁধা, আর কাপড় দু'বেলা সাবান দিয়ে কেচে রং কোরে দেওয়া। ওদের বাড়ীর মেয়েরা খুব বেশী রং করা কাপড় ব্যবহার করে, প্রত্যহই রকম রকম রংয়ে কাপড় রঙিয়ে দিতে হয়।"

"হীরালাল বাবুর স্ত্রীটি কেমন দেখতে?"

"বেশ সুন্দরী, কিন্তু হ'লে কি হয়, বাবুরা তো রাত্রে বাড়ী থাকেন না।" শৈল চোখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা সবিস্ময়ে কহিল, "সবাই কি ঐ রকম? মেয়েরা কিছু বলে না?"

শৈল বিজ্ঞভাবে কহিল, "বলবে আবার কি? নতুন ব্যাপার তো কিছু নয়, মেয়েরা খাওয়া পরা আর সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত, বাবুরা বাইরে যা করুক, মেয়েদের সে খোঁজে দরকার কি? তাদের খাওয়া পরার কিছু দুঃখু নেই। বাগান বাড়ী না থাকলে—বাইজী না থাকলে বড়লোক ব'লে চিনবেই বা কে?" মনোরমার কাণে কে যেন বিষ ঢালিয়া দিল—সমাজের এ কি রীতি? এ কি ব্যবহার? এই

অসংযত চরিত্রের ইন্দ্রিয়লালসার চরিতার্থতাই আবার বড় মানুষীর একটা লক্ষণ বলিয়া গণ্য ? দেশ কি এতই অধঃ-পতিত ? এই পুরুষ জাতিই আবার প্রতি কথায় নারীর সতীত্ব- বাক্যে এবং চিন্তায় পর্য্যন্ত কতটুকু আহত হইয়াছে তাহার বিচার কঠোরভাবে করিয়া আসিতেছে ?

সহসা মনোরমার দৃষ্টি দেওয়ালে লম্বিত চিত্রখানির উপর পতিত হইল ! এতদিন সেখানি সে ভাল করিয়া দেখে নাই, চিত্রের বিষয় কি সুন্দর—কি মর্ম্মস্পর্শী ! রাজনন্দিনী, রাজ-বধূ, রাজরাণী সীতা, পতি কর্ত্তৃক বিনাপরাধে পরিত্যক্তা হইয়া বাল্মীকি কুটীরবাসিনী !

গর্ভবতী জানকী—লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বনে নির্ব্বাসিতা হইয়া রামের নিকট হইতে দূরে বাস অপেক্ষা সরযূ সলিলে জীবন বিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ভে যে ভাবী রাজবংশধর । নিজে কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বংশনাশ মহাপাপকে তিনি কেমন করিয়া স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবেন ?

নির্জ্জন বনমধ্যে একাকিনী বটবৃক্ষমূলে দীনবেশে কর-তলে কপোল রাখিয়া জানকী বসিয়া আছেন । সম্মুখে নির্ম্মল সলিলা প্রবাহিণী বহমানা. সেই নদীর বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গের প্রতি উদাস দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া আছেন । চিত্রকর নিপুণ তুলিকাস্পর্শে দেবীর হৃদয়ের করুণ ভাবটুকু চোখে ও মুখে অতি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । যে স্বামীকে

দেবতা জ্ঞানে প্রাণাধিক প্রিয়তম বোধে ভালবাসিয়া—ভক্তি করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তিনি নির্ম্মম হৃদয়ে কলঙ্কিনী বলিয়া সতী নারীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ অবস্থায় প্রিয় পতির প্রতি রমণীর কতখানি ব্যথাপূর্ণ অভিমান হইবার কথা! এমন কি স্বামীর প্রণয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হইবারই বিষয়, কিন্তু সীতার প্রাণ কি সে-জন্য একবারও বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, স্বামীকে প্রাণহীন পাষাণদেবতা বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি তাঁহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে? না, তাহা হয় নাই। তিনি স্বামীর প্রণয়ে গভীর বিশ্বাসশালিনী। রামচন্দ্রের অকপট প্রাণপূর্ণ ভালবাসায় তাঁহার যথেষ্ট আস্থা আছে। সেই জন্যই তিনি এতখানি বেদনা, এত বড় গুরুতর আঘাত বুক পাতিয়া সহিতে পারিয়াছেন। তিনি জানেন, কঠোর কর্ত্তব্যের কর্কশ অঙ্গুলি নির্দ্দেশেই প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে বিসর্জ্জন দিয়া, কি অনল বুকে ধরিয়া রামচন্দ্র রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, সীতা-বিরহে তাঁহার হৃদয় কতখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বরং এইটুকু নিঃসংশয়ে জানেন বলিয়াই দেবী এখনো বাঁচিয়া আছেন। স্বামীর প্রণয়-স্মৃতিই তাঁহার জীবনীশক্তি, দেহের শোণিতকণা, মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার গভীর সূচিভেদ্য অন্ধকারে চকিত বিদ্যুৎ স্ফুরণ। সুনিপুণ চিত্রকর সীতার সুকুমার মুখখানিতে নিটোল ললাটে, ও পুষ্পিত ওষ্ঠাধরে যুগপৎ বিষাদ ও প্রেমের এমনি একটি সুন্দর ভাব ফুটাইয়া

তুলিয়াছেন, যাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনোরমা চিত্র দেখিতে দেখিতে যেন তন্ময় হইয়া গেল, সীতার বেদনা যেন সে সম্পূর্ণ আপন হৃদয়ে অনুভব করিল, নিজের দুর্ভাগ্যের কথাও স্মরণ হইল। মনে মনে ভাবিল, ভাগ্যবতী সীতা, পতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা, পরিত্যক্তা হইলেও পতির হৃদয়ে তাঁহার আসন সম্পূর্ণ অটুট ছিল। পতির প্রণয়ে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য বঞ্চিতা হন নাই। এর চাইতে নারী আর কোন মহৎ সম্পদ্ কামনা করিবে? আর রামচন্দ্রের ন্যায় পতি! রাজপুত্র, রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া খ্যাত নহে; কিন্তু চরিত্রবলে, সাধুতা ও শীলতার বীর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে, কি অপূর্ব্ব মহত্ত্বে এক দেবোপম উদার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল, যাহার কল্পনা ও চিন্তাতেও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, কি একটি মহত্তর আদর্শ চক্ষুর সম্মুখে জাগাইয়া দেয়। মনোরমা সসম্ভ্রমে যোড়করে দেবদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিল।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। শৈল যে কখন চুল বাঁধা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। বারেন্দায় আসিবামাত্র মনে হইল, পাশের ঘরে অস্পষ্টস্বরে কে কথা কহিতেছে, মনোরমা দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু সে যাহা দেখিল, তাহাতে ঘৃণায় ও লজ্জায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। শৈলের হাত ধরিয়া সন্তোষ কি যেন বলিতেছে। মনোরমাকে দেখিবামাত্র সন্তোষ চলিয়া গেল। মনোরমা শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিল।

২০

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি। প্রখর গ্রীষ্মে, আম কাঁঠাল লিচু প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর সুরসাল ফলগুলি প্রাণ ভরিয়া খাইয়াও লোকে পোড়া গ্রীষ্মকালকে গালি দিয়া, বর্ষার শীতল বারি বর্ষণের আশায় সতৃষ্ণ নয়নে আকাশপানে চাহিয়া আছে। কয়দিন এক একবার মেঘ আসিয়া জ্বালাময় রৌদ্র-দীপ্ত দিনগুলিকে ছায়া শীতল করিয়া তুলিলেও বৃষ্টিপাত মোটেই হয় নাই। আজ কিন্তু বৃষ্টি আসন্নপ্রায়, সকাল হইতেই মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। শীতল বাতাস সকলের দেহে অমৃত স্পর্শ বুলাইতেছে, গঙ্গার ঘাটে ছেলে মেয়ের দল মহোল্লাসে সাঁতার কাটিতে কাটিতে বৃষ্টির ছড়া বলিতেছে। আজিকার দিন সকলেরই মনে যেন একটা নবীন আনন্দ—নবীন ভাবাবেশ জাগাইয়া তুলিয়াছে। কৃষকগণ সাগ্রহে নববর্ষার প্রথম দিনটিকে প্রফুল্লনেত্রে অভিনন্দন করিতেছে, কত শত বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটি দিন, কবি কালিদাসের অন্তরের কল্পনা-বধূকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার সোণার কাঠির স্পর্শে গোপন-হৃদয়বাসিনী বিরহিণী জাগিয়া উঠিয়া এমন করুণ গাথা গাহিয়াছিল, যাহা কবির অমর লেখনী মুখে নিস্পন্দিত হইয়া জগতের নরনারীকে আজো মাতাইয়া রাখিয়াছে।

প্রতি বৎসরে এমনি দিন, নূতন করিয়া নূতন ভাবে

আসিয়া দেখা দেয়, আর সকলেরই হৃদয় কি এক অজ্ঞাত বস্তুর বিরহে কাতর হইয়া, চঞ্চল-চরণে যেন অভিসার যাত্রা করে। কিন্তু সে অজ্ঞাত যে কি, তাহা না জানাতেই যেন সকল রহস্য, সকল আনন্দ নিহিত। আজিকার শীতল বাতাস কি হনুমানগুলাকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে? দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষ হনু—স্ত্রী হনু বুকে শাবক বাঁধিয়া কেহ বা শাবককে সঙ্গে লইয়া এ গাছ হইতে ও গাছে, এ বাড়ীর ছাদ হইতে ও বাড়ীর ছাদে আলিসায় লম্ফ দিয়া ফিরিতেছে। বহরমপুরের দিকে হনুমানের অত্যন্ত প্রভুত্ব। গাছগুলির কাঁচা পাকা ফল ছিঁড়িয়া পাতা ফুল নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া কতক খাইয়া, কতক ফেলিয়া তাহাদের সে-কি উল্লম্ফন ও আনন্দধ্বনি! হাজার উপদ্রব করিলেও কেহ তাহাদিগকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতে বা লাঠি লইয়া খোঁচাইতে পারে না। মুখের তাড়া তাহারা গ্রাহ্যও করে না। মনোরমার চক্ষে এ দৃশ্য ও নূতন। সে কৌতুকের সহিত এ দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল। পাশে পাড়ার জানকীয়ার মা দাঁড়াইয়া ছিল। মনোরমা কহিল, "ওরা তো বড় অত্যাচার করে দেখচি! গাছপালা লতাপাতা সব যে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেল্‌লে, ঐ তোমার চালে ব'সে কচি কচি কুমড়ো গুলো খাচ্ছে, কাদের চাল থেকে ছিঁড়ে এনেচে আর কি?"

জানকীয়ার মা কহিল, "দু'দশ দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়,

বেশ উপদ্রবও করে, আর এক একদিন যেন মাতুনি আরম্ভ হয়। কেঁইয়ারা আবার সাধ ক'রে এক একদিন ওদের রুটি ফল ছড়িয়ে খাওয়ায়, সে দিন কি ব্যাপার! পালে পালে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়, আর দু'হাতে খায়।"

মনোরমা কহিল, "দেখতে বেশ মজা লাগে তো, কেঁইয়ারা কি ওদের জন্যে থাকবার বাড়ীও দিয়েছে না কি? থাকে কোথা এত?"

জানকীয়ার মা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, "বলচেন মিথ্যে নয়, ওদের জন্যে একটা ধর্ম্মশালা ক'রে দিলে হয়। বাড়ী না ক'রে দিলেও কেঁইয়াদের শাসনে কেউ ওদের ঢিল পর্য্যন্ত ছুঁড়ে মারে না। একবার একটা বাবু গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে বন্দুক ক'রে একটা হনু মেরেছিল। পরদিন কলেরা হয়ে সে লোকটি ম'রে গেল ওরা রামের চর. তবে ওদের উপদ্রবে ক্ষেতের পটল, শসা, কাঁকুড়, গাছের ফল বড় লোকসান হয়।

এই সময়ে দরোয়ান কালীসিংহের সহিত একটি ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া মনোরমা বাগান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিবামাত্র, স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে কে ডাকিল, "মনু মা?" কত দিন এ স্নেহ আহ্বান মনোরমার কাণের ভিতর অমৃতধারা ঢালিয়া পরাণের বালিকা ভাবকে নাচাইয়া তুলে নাই। মনোরমা চকিতে ফিরিয়া পুলক-

কম্পিত বক্ষে পিতার পদধূলি লইল। রমাকান্ত বাবু সস্নেহে কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

মনোরমা পিতার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহোজ্জ্বল-কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা, কেমন আছ? মা কেমন আছেন?"

"সবাই ভাল, তোর জন্যে তোর মা সারা হ'য়ে যাচ্চেন। কিন্তু মনু, এ-কি হয়ে গেছিস মা?" রমাকান্ত বাবু শিহরিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বর্ণপ্রতিমা অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী মনোরমা একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে। এ কি অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন! চক্ষু যেন নিষ্প্রভ, গণ্ড দু'টি পাণ্ডুর, সুগঠিত দেহখানি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুৎকান্তি সতীর পিতা দক্ষরাজ, সতীর কালিমামূর্ত্তি দেখিয়া যতটা মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, রমাকান্ত বাবু বুঝি ততোধিক ব্যথা অনুভব করিলেন।

পিতার প্রাণস্পর্শী বেদনাসূচক প্রশ্নে মনোরমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, পিতার চরণে আছাড়িয়া পড়িয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লয়। কিন্তু দুঃখের ভার তখনি মানুষের বুকের মধ্যে বিরাট বোঝার সম হইয়া নিশ্বাস পর্য্যন্ত চাপিয়া ধরে, যখন সে নিজের কাহিনীর একটি মাত্র কথাও অপরকে জানাইতে পারে না।

মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাকে সংযত করিয়া, হাস্যমুখে মনোরমা কহিল, "এসো বাবা, ঘরে এসো, তুমি যে হঠাৎ এলে?"

"তোর গর্ভধারিণী তোর জন্যে বড় অস্থির হয়েচে, কান্না কাটি করচে, আমি তাই তোকে নিতে এলুম, জামাই কই ?"

মনোরমা পিতাকে লইয়া গৃহে আসিল। অন্নপূর্ণা আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। রমাকান্ত বাবু প্রণাম করিয়া কহিলেন "মনুর চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন ? আমাকে যদি একবার জানাতেন, নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা পত্র করাতুম। ভিতরে হয় তো কোন অসুখ বিসুখ হয়েচে।"

অন্নপূর্ণা জানিতেন, মানসিক ব্যাধিই মনোরমার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের মূল। কোন কথা এখন আর গোপন করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "আমার পোড়া কপাল বেহাই মশাই, মনের অসুখেই বৌমা এমন হয়ে যাচ্ছে। বাছার মুখের দিকে চাইতে আমার চোখে জল আসে। আমি কতবার আপনাদের কাছে যাবার জন্যে বলেচি, তা যেতে চায় না। সন্তোষ তো আর শোধরাল না, দু' দু'টো সোণার প্রতিমা ঘরে আনলুম; কিন্তু ছেলের মতি-গতি ফিরলো না।"

রমাকান্ত বাবু সকলি বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, "আমি আজই মনুকে নিয়ে যাচ্ছি। আর দশদিন পরে এলে বোধ হয় মেয়েটাকে ফিরে পেতুম না। আপনারাও কল-কাতায় চলুন, অনেক দিন এসেচেন। মনোরমার জননী

মেয়ের জন্য পথ চেয়ে আছেন। মেয়ে চিঠিতে কোন কথাই লেখে না—জবাবই বড় একটা দেয় না।"

অন্নপূর্ণা সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "সন্তোষ আজ বৈকালে আসবে বলে গেছে, সে এলে আপনি জিজ্ঞেস করে নিয়েই যান।"

রমাকান্ত বাবুর ক্রোধাগ্নি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পরুষকণ্ঠে কহিলেন, "কেন? আমি কি তাকে না জিজ্ঞেস করে নিয়ে যেতে পারবো না? সে যদি নাই আজ আসে, বা নিয়ে যেতে না দেয়? আমার মেয়ে আমি নিয়ে যাব, তার হুকুম আমি চাই না। বিয়ে ক'রে কিনে ফেলেচে আর কি? একেবারে হত্যে করতে বসেচে! যার কর্ত্তব্যজ্ঞান নেই, তাকে আমি পশু বলে মনে করি। যে মেয়েকে আমরা বুক দিয়ে ঢেকে মানুষ করেচি, তার এ নির্য্যাতনে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। মনু তুমি প্রস্তুত হও।"

অন্নপূর্ণা আর কথা কহিলেন না। মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া কহিল, "বাবা চুপ করো, তোমার পায়ে পড়ি বাবা। আমার শাশুড়ী মাটির মানুষ তাঁর দোষ কি?"

রমাকান্ত বাবু আজ বড় দুঃখে রাগিয়া গিয়াছেন, সুতরাং কহিলেন, "দোষ তো তাঁরই, ছেলেকে তিনি প্রথম হোতে শাসনে রাখতে পারেন নি, নইলে এতটা বাড়াবাড়ি হেতো না। আজ বড় অসহ্য হয়েচে বলেই

বলচি, তিনি বিয়ের সময় ছেলের বিষয় সমস্ত গোপন করেছিলেন, তার জন্যেই আমার এ সর্ব্বনাশ।”

অন্নপূর্ণা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চলিয়া গেলেন। হায়, হায়, পুত্রস্নেহান্ধ হইয়া, পুত্রের হিতের জন্য তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার জন্যই তাঁহাকে দোষের ভাগী হইতে হইয়াছে। পুত্রের সুখের জন্য তিনি যে কতখানি দিয়াছেন, ও এখনও দিতে পারেন, অপরে তাহা কি বুঝিবে! কিন্তু ওহো, এমনি সন্তান-স্নেহ তো সবারি! রমাকান্ত বাবুরই বা দোষ কি!

অন্নপূর্ণাও পিতার সহিত মনোরমার চলিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। সন্তোষ আসিয়া অনর্থ বাধাইবে? তা আর কি করা যায়! এদিকে রমাকান্ত বাবু কহিলেন, “মনু, প্রস্তুত হও, তোমায় আমি রেখে যাব না।”

মনোরমা করুণ-কণ্ঠে কহিল, “বাবা, আজকের দিনটা থাকো, আমি চলে গেলে আমার শাশুড়ী ক্ষুণ্ণ হবেন, উনিও দু’একদিনে যাবেন, আমি ওঁর সঙ্গেই যাব। রাগ কোরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি।”

রমাকান্ত বাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার মনে হইল হয়-তো মনোরমা স্বামীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতে চায়। তবে হয়-তো তিনি যতটা ভাবিয়াছেন, ততটা নয়, উভয়ের মধ্যে কতকটা

অনুরাগ জন্মিয়াছে। কহিলেন, "মনু, তুমি যাতে খুসী হও, আমি তাই কোরবো মা, তোমার অনিচ্ছায় তোমায় আমি নিয়ে যাব না, কিন্তু বাছা, তোমার গর্ভধারিণী আমায় তোমাকে নিতে পাঠিয়ে পথ চেয়ে বসে আছেন, তাঁকে গিয়ে কি জবাব দেবো ?"

ঠিক এই সময়ে নৌকাযাত্রী কোনও আরোহী সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেছিল—

"যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী,
হেরিতে সে মুখ বিলম্ব সহে না।"

প্রাণাধিকা দুহিতার জন্য, হিমালয় মহিষী মেনকার এই প্রাণস্পর্শী মাতৃস্নেহ বাঙালীর ঘরে, মাতা ও কন্যার মধ্যে এমন একটি করুণরস-সিক্ত আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছে, যাহা জগতের অপর কোনও সাহিত্যে সুদুর্লভ।

মনোরমার বক্ষ আবেগভরে কাঁপিয়া উঠিল। পিতার চরণে লুটাইয়া বিবশার ন্যায় কহিল, "বাবা, আমি কি দোষ করেছিলাম যে আমায় তোমরা পর করে দিলে।" কতখানি অব্যক্ত বেদনা ঐ কয়টি কথার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল! রমাকান্ত বাবু অশ্রু-সজল-চক্ষে কন্যাকে তুলিয়া বুকে ধরিলেন।

২১

মাষ্টার-গৃহিণী বিরজাসুন্দরী বৃহৎ আঙিনায় কয়েকখানি কালো পাথরে আমসত্ব শুকাইতে দিয়া, একটা বড় পাত্রে একরাশি আম ছাঁকিয়া মাড়ি তৈয়ার করিতেছিলেন। পঞ্চমবর্ষীয় রুগ্নকায় বালক সনৎ ওরফে সোনা, নিকটে বসিয়া তৃপ্তির সহিত কয়েকটা আম চুষিতেছিল, মুখে গায়ে পেটে যথেষ্ট আমের রস লাগিয়া ভোক্তার ভোজনপটুতার পরিচয় দিতেছিল।

বিরজা, মাষ্টারের দ্বিতীয় সংসার, তথাপি তিনি স্বামীর মনটি যথেষ্টরূপে বাঁধিতে পারেন নাই। গান বাজনা শিখাইবার জন্য হরকুমারকে অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকিতে হয়। বিরজা এজন্য অনেক সময় বকাবকি করেন, কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয় না। আজ তিন দিন হইতে হরকুমার বাড়ী আসেন নাই, বিরজা আপন মনে এই বলিয়া বকিতেছিলেন,—পয়সা রোজগারের কপালে আগুন, কি বিদ্যেই শিখেছিলেন। এমন লোকের হাতেও মানুষ পড়ে। আজ আসুক একবার, নিজের ঘর দোর, স্ত্রী পুত্তুর কিছু মনে থাকে না গা! ছি ছি গলায় দড়িও জোটে না, এমন বেহায়া মানুষ!

সোনা নিবিষ্টচিত্তে আম চুষিতে চুষিতে বলিয়া উঠিল, "মা, বাবার কাছে যাব।" বিরজার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি

পড়িল, ঝঙ্কার করিয়া কহিল, "তাই যা, সে তো যমের বাড়ী গেছে, তার কি আর—"

"সে যমের বাড়ী গেলে সামনের পুজোয় নূতন প্যাটানের তারের বালা পরাবে কে গো? লাল ফুলের চওড়া পেড়ে রেশমী বালুচরী শাড়ার অর্ডার হ'য়ে গেছে যে।"

কথাগুলা বড়ই মোলায়েম! বিরজাসুন্দরী ঝগড়া করিবার জন্য যতগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ বাছিয়া রাখিয়াছিলেন, পোড়া মনের মধ্যে এখন আর কোনটারই খোঁজ পাওয়া গেল না। মুখ ভার করিয়া কহিলেন, "ভালো যা হোক্, ছেলে মেয়ে দু'টো হেদিয়ে মোলো, একটু খোঁজ খবরও নেই, আমি না হয় পরের মেয়ে,— পেটের সন্তান, তাদের তো খোঁজ রাখতে হয়?"

হরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমার পেটের না, তোমার পেটের? আয় খোকা, বিণী কই?" খোকা বাপকে দেখিয়া কোলে উঠিবার জন্য তাড়াতাড়ি হাত ধুইতে গিয়াছিল, আসিয়া কোলে উঠিয়া কহিল, "বাবা, বিনী ক্ষান্ত দিদির বাড়ী বেড়াতে গেছে।"

"মেয়েটাকে ওদের বাড়ী যেতে দাও কেন? দিন দিন বড় হচ্ছে, তোমার কি আক্কেল নেই?"

এ্যাত বড় কথা! বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিলে চটে না কে? বিরজা রাগিয়া উঠিয়া কহিল, "আমার আক্কেল নেই, না, তোমার? নিজে ছোট বেলা থেকে

স্থাওটা করিয়ে দিয়েচ, এখন বাগ মানবে কেন? ক্ষেনিকে গান শেখাতে যেতে ওকেও নিয়ে যেতে—সেই থেকে ক্ষেনিও ওকে না দেখলে বাঁচে না, মেয়েটারও ক্ষান্তদিদি বলতে তর সয় না, এখন আবার আমায় দুষচেন, মিন্‌সের মতিচ্ছন্ন আর কি? বলি খেয়েচ না, ভাত টাত খাবে?"

"খেয়েচি গো, যে-টুকু ক্ষিদে ছিল, তোমার মিষ্টি কথাতেই পেট ভোরে গেলো।"

"আর রসিকতা করতে হবে না, সংসারী লোক যে এমন ক'রে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা এই তোমাকেই দেখচি।" বিরজা আম মাড়া শেষ করিয়া হাত ধুইতে লাগিলেন। হরকুমার কহিলেন, "অতো চটো কেন? তিন দিনের পর বাড়ী এলাম, দু'টো মিষ্টি কথা কও। পয়সার ফিকিরে থাক্‌তে হয়, বুঝতে পার না। ঝি কোথা গেল, বাড়ী গেছে বুঝি? আচ্ছা, তুমি পাণ আন, খোকা হুঁকা কল্‌কেটা আনতো বাবা, আর একটা টিকে।"

খোকা দৌড়িয়া হুঁকা কলিকা আনিতে গেল, বিরজা এক ডিবা পাণ লইয়া আসিল। হরকুমার কলিকায় আগুন ধরাইয়া তামাকুতে টান দিতে দিতে কহিলেন, "সন্তোষকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েচি, সে খুব উৎসাহে গান বাজনা শিখচে, দু'শো টাকা মাইনে দিচ্চে, অমন দাঁও কি ছাড়তে আছে? মেয়েটা বড় হলো, বিয়ে দিতে হবে, বরের যে

বাজার, টাকা পয়সার জোগাড় চাই তো! তোমাদের ভাবনা ভাবি না তো আর ভাবচি কি? ঝি রয়েচে, হরেন রয়েচে, ছেলে মেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে আছ, জলে তো পড়ো নি। স্যাকরাকে তোমার চুড়ির বায়না দিয়ে দিয়েচি, কাল একখানা বালুচরে শাড়ীর বায়না দিয়ে এলাম, টাকা ত্রিশ দাম হবে।"

এমন সময়ে কান্তর সঙ্গে বিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দুই হাতে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, তুমি আর আস না কেন? আমায় আর ভালবাস না বাবা।" হরকুমার কহিলেন, "এই যে পাগলী শুদ্ধ পাগলীর মায়ের মতন ঝগড়া সুরু করেচে। তোদেরই জন্যে আসতে পারিনি, পাঁচ ফিকিরে ঘুরি। কি কান্ত, খবর কি? ভাল আছিস্ তো?"

কান্ত বসিয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবু, ভাল আছি। মেয়েটা বড় আপনাকে খোঁজ করে। রোজ ঘরে এলেই হয়, ছেলে পিলে অস্থির হয়, পাঁচবার জিজ্ঞেস পড়া করে—এই আর কি?"

বিণী বাম হাতের মুঠাটি বন্ধ করিয়া সোনাকে কহিল, "খোকা বল্ দেখি, এতে কি আছে?" সোনা কহিল, "কিছু না, ফোকা!"

বিণী কহিল, "আচ্ছা বাবা বলো দেখি, টোকা না

ফোকা ?" হরকুমার তামাকুতে টান দিয়া, হা করিয়া ধূঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন, "ফোকা, ফোকা নয় রে খোকা ?"

খোকা হাত তালি দিয়া কহিল, "কেমন ? বাবা আমার দলে।" বিণী তৎক্ষণাৎ সকলের সমক্ষে মুঠাটি মেলিয়া দিল, ঝক্‌ঝকে দু'টি ছোট সোণার মাকড়ী। খোকা ছোঁ মারিয়া একটি তুলিয়া লইল। বিণী চীৎকার করিয়া উঠিল বিরজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা পেলি লো ! ক্ষেনির কীর্ত্তি আর কি ? ও-সব ওর হাতে কেন দেওয়া, ওর তো সেদিন কাণ বিঁধিয়েচে, এখনও শুকোয় নি।"

ক্ষেনি কহিল, "শুকিয়ে যাবে—আমি একটা ওষুধ লাগিয়ে দিয়েচি মাকড়ী বাক্সয় এখন তুলে রাখো, আমি ওর নাম ক'রে কিনেছি। খোকা তোকে একটা জিনিষ দোবো, ওর মাকড়ী দিয়ে দে।" অনেক সাধ্য সাধনায় খোকা বিণীর মাকড়ী ফেরং দিল, বিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বিরজা জিজ্ঞাসা করিলেন. "হাঁরে ক্ষান্ত, কি হলো রে, সে ছেলেটার কি গতি হলো, সরকারে নিয়ে গেল না কি করলে ?"

হরকুমার কহিলেন, "ওঃ, সেই পশ্চিমাদের ছেলে ? যার মা গঙ্গা নাইতে এসে ম'রে পড়েছিল ? একটা হুজুগ আজ সকালে শুনছিলুম বটে।"

ক্ষান্ত কহিল, "আহা বাবু, সে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেচি। কি জাত, কোথাকার লোক, কিছু বোঝা গেল

না, দোকানদাররা বল্লে রাতে দু'পয়সার কচুরী কিনেছিল। সকালবেলা সবাই দেখে যে, অশ্বথ গাছের তলায় মেয়েমানুষটি শুয়ে আছে, শ্বাস ধরেচে, মুখে চোখে মাছি ভ্যান ভ্যান করচে। কোলের ছেলেটা এক বছরের হবে আর কি, ব'সে ব'সে মা মা ক'রে—কাঁদচে, মাকে ঠেলা দিচ্চে, একবার ক'রে মাই চুষচে। দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল, মেয়েমানুষটো তখুনি স্থির হ'য়ে গেল—মরে গেল আর কি? ছোট ছেলে সে তো বুঝছে না, সেই মরা মারই মাই খাচ্ছে, আর কাঁদচে। আর এত মাছি সেই মরার গায় তখন বসেচে, ছেলেটাকে শুদ্ধু ছেঁকে ফেলেচে। কত লোক ছেলেটাকে খাবার দেখিয়ে হাত ইসারা ক'রে ডাকতে লাগলো, যদি মরাটাকে ছেড়ে একটু সরে' এসে বসে। তা সে পোড়া ছেলে মাকে ছেড়ে একটুকুও নড়লো না। কত লোক খাবার কিনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছেলেটার গায়ে ফেলতে লাগলো। ছেলেটা তাই একবার একটু খায়। একবার মরার মাই চোষে, আবার মাকে ঠেল দেয়। দেখে চোখ দিয়ে জল আসছিল।"

বিরজা কহিলেন, "আহা, মায়ের বাছা, মা এমনি জিনিষ রে! কোন রোগ টোগ হ'য়ে কাহিল হয়েছিল বোধ হয়। গঙ্গা নাইতে এসেছিল, এইখানে তার মাটী কেনা ছিল আর কি।"

ক্ষান্ত কহিল, "রোগ হয়েছিল বই কি? চেহারা যেন

কাঠ হয়েছিল, দেহে মাংস ছিল না। সে যদি বাছা একবার চোখে দেখতে! ছেলেটাকে কেউ ছোঁয় না। কি জাত—ডোম কি ম্যাথর, কাপড় চোপড় মাগীর যে ময়লা, আর দুর্গন্ধ, কাযেই কে ছোঁবে বল?"

বিরজা কহিলেন, "তা তো বটেই, তারপর কি হলো?"

কান্ত কহিল, "তার পর মা অবাক্ কাণ্ড, ঐ হীরালাল বাবুর পিসী গঙ্গা নাইতে এসে সব দাঁড়িয়ে দেখলে। দেখে দেখে নিজের ঝিকে বল্লে, ছেলেটা মরার মাই চুষচে, ওকে তুই সরিয়ে নিয়ে চল। কোম্পানীকে খবর দিলে এখুনি নিয়ে যাবে। ঝি তো রেগে অস্থির। বলে পরের বোঝা বইতে গেলাম কেন? কিসের মরা তাই আমি ছুঁয়ে মরি আর কি? এ্যাতো আমার দায় নেই বাপু। তখন হীরালাল বাবুর পিসী নিজে গিয়ে, ছেলেটাকে কোলে ক'রে, হুসহুস ক'রে গঙ্গায় চুবিয়ে কোলে নিয়ে সটান বাড়ী চ'লে গেল। অত বড় লোকের বাড়ীর মেয়ের এই কাণ্ড দেখে সবাই অবাক্ হ'য়ে রইল। তার পর শুনলুম সরকারের লোক এসে মরাও পোড়াতে নিয়ে গেছে, ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে।"

হরকুমার কহিল, "তা বেশ করেচে। ওদের দয়ার শরীর। তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলি, আর হা হুতাশ করছিলি। তিনি কাযের মতন কায করলেন।"

বিরজার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল, বিণী স্তব্ধ-

ভাবে মায়ের কোলে বসিয়া হাঁ করিয়া করুণ কাহিনীটি শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, মা মরে গেল? তাই কি হয়? কান্ত দিদি এ কি রকম বিশ্রী গল্প বলচে।

২২

আহার করিতে করিতে সহসা মুখ তুলিয়া সন্তোষ মাতাকে কহিল, "মা, দিদিকে লেখো, আমার আরও দু'শো টাকা চাই,—আমি মাষ্টারের কাছে গান বাজনা ভাল করে শিখচি—"

অন্নপূর্ণা তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আমার লেখায় কিছু হবে না। আর বিদেশে ভাল লাগচে না, চল্ বাবা, বাড়ী ফিরে যাই। সেখানে কত মাষ্টার পাবি। কলকাতায় গান বাজনা শেখবার দুক্কু কি?"

সন্তোষ রাগিয়া কহিল, "তোমার না ভাল লাগে মা, তুমি যাও, আমি দিন কতক এখানে থাকতে চাই। ওরা কোথাকার কে এসে জুড়ে বসেচে, ভাল চায় তো বিষয় ছেড়ে দিক্, নয় তো একটা অনর্থ বাধিয়ে তুলবো।" বলা বাহুল্য, সন্তোষ দিদিকে একটু ভয় করিয়াই চলিত, কিন্তু এখানে সে অনেক পরামর্শ-দাতা, অভয় প্রদানকারী বন্ধু-বান্ধব পাইয়াছে।

অন্নপূর্ণা রাগিয়া কহিলেন, "তবে তোর যা ইচ্ছে কর।

বৌ-মাকে নিয়ে কালই আমি চলে যাচ্ছি। ভাল তো আর এ জন্মে হলি নে, ভাল কথা কাণে তুলবি নে। পরের মেয়েটাকে শুদ্ধ মেরে ফেলতে বসেছিস্। বেয়ায়ের কি কম মনের দুঃখু! ভদ্র লোক সে দিন এলো, জলস্পর্শও করলে না, শুধু মুখে ফিরে গেলো। কি ঘেন্না, কি লজ্জার কথা গা! এত পাপ করেছিলাম আমি!"

সন্তোষ কহিল, "বড় বয়েই গেল, তাঁকে আসতেই বা সেধেছিল কে? তাঁর মেয়ে এখন আমার স্ত্রী। তাঁর জোর না আমার জোর? তুমি যেতে চাও চলে যাও,—কিন্তু খবরদার, আমার পরিবারকে নিয়ে যেয়ো না, সে আমার কাছে থাকুক।"

অন্নপূর্ণা বেগতিক দেখিয়া কহিলেন, "বৌ মার শরীর খারাপ হয়েচে দেখচিস না? কি সোণার প্রিতিমে, কি হ'য়ে গেছে। বাপের বাড়ী দিন কতক গিয়ে থাকুক, তারা চিকিৎসাপত্তর করুক।"

"কেন? আমার পয়সা নেই, আমি চিকিৎসা করাতে জানিনে? বাঁচে বাঁচবে, মরে মরবে, আমার কাছে থাকবে, সে আমি বুঝবো।"

ইতিমধ্যে কমলা আসিয়া দাঁড়াইল। সন্তোষকে দেখিয়া মাথায় কাপড় আর একটু টানিয়া মনোরমার গৃহে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সন্তোষ ডাকিল, "সই যে! কি ভাগ্যি! সূর্য্য কি পশ্চিমে উঠেচে?"

ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কমলা কহিল, "কেন, আমি তো প্রায় আসি! সই বড় লোকের গিন্নি, একদিনও গরীবের কুটীরে পায়ের ধুলো দিতে যান না।"

সন্তোষ কহিল, "যাবে না কেন! তুমি নিয়ে গেলেই যেতে পারে। আমার হুকুম চাই? হুকুম আমি দিলাম। মা, তুমি কলকাতায় যেতে চাও যাও, বৌ এখানে বেশ থাকবে। এই পাশেই সইরা রয়েচেন, আমার বন্ধুরাও এক একদিন নিয়ে যেতে চান; তাহাদের স্ত্রীরাও মাঝে মাঝে আসবেন, কোনও ভাবনা নেই।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "কি-যে বলিস্ তার ঠিক নেই, ছেলে মানুষ বৌ, আমি একলা রেখে যাই কোন্ সাহসে! কার ভরসায় আমি বিদেশ বিভূঁয়ে সোমত্ত মেয়ে রেখে যাবো?"

চক্ষু কপালে তুলিয়া সন্তোষ কহিল, "কার ভরসায়? শুনচ সই? আমি স্বামী রইলাম, অথচ মা স্বচ্ছন্দে বলচেন, কার ভরসায় রেখে যাই? স্বামীর চাইতে স্ত্রীলোকের আবার রক্ষক কে আছে? মা তুমি সেকেলে লোক, কিছু বোঝ সোঝ না, নইলে এমন কথা বলতে না। বলো তো সই, স্ত্রীলোকের স্বামীর চাইতে বড় আর কে? পতিই সতীর দেবতা!"

কমলা হাসিয়া কহিল, "আর দেবতা যদি অপদেবতা হয়?"

হা হা করিয়া হাসিয়া সন্তোষ কহিল, "বাঃ সই, বেশ

বলেচ! অপদেবতা হ'লে ঘাড় মটকাবার ভয়ই বেশী, নয় কি ?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তুই যদি মানুষ হ'তিস্, সে আলাদা কথা। কত দিন তো বাড়ীই থাকিস না।"

"মানুষ নই তো ভূত না কি ? কি-যে বলচ মা, আমার স্ত্রী তুমি নিয়ে যেতে পারবে না, তোমার জোর না আমার জোর ?"

কমলা সে-স্থান পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া মনোরমার গৃহে আসিল। মনোরমার হাতে একখানি চিঠি, দুই চক্ষে অশ্রু টল টল করিতেছে, উদাসনয়নে খাটের উপর বসিয়া আছে। কমলাকে দেখিয়া মনোরমার মলিন অধরে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল, "এসো সই-দিদি, আজ ক'দিন আসো নি ?"

"তুমি তো ডাকতেও পাঠাও নি," বলিয়া কমলা আসিয়া মনোরমার পাশে বসিল। কৌতূহলী নেত্রে গৃহের চারিদিকে দেখিতে লাগিল। বাংলাখানির ভাড়া মাসিক ১০০৲ টাকা। গৃহের মেঝে শ্বেতপাথরে বাঁধানো। ঘরগুলি ঝাড় লণ্ঠন ও বড় বড় তৈলচিত্রে সুশোভিত। মূল্যবান্ টেবিল চেয়ার সোফায় ঘর সুসজ্জিত। কাচের আলমারীর মধ্যে সুন্দর সুন্দর পুতুল ইত্যাদি সাজানো রহিয়াছে। মনোরমার টেবিলের উপর দুই পাশে দুইটি শুভ্র প্রস্তর-নির্ম্মিত পরীর হাতে শামাদান শোভা পাইতেছে। কমলা

প্রায়ই আসে, কিন্তু আজ সে যেন মনোনিবেশ সহকারে সকল খুঁটিনাটি জিনিষও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। ঘরের আলনায় মনোরমার মূল্যবান্ শাড়ীগুলি ঝুলিতেছে। জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া কাপড়ের চওড়া জরীর পাড়-গুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

অন্নপূর্ণা ইদানীং বধূর পরিচ্ছদ পারিপাট্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছেন। নিজে মনোরমার ট্রাঙ্ক খুলিয়া কয়খানি রেশমী শাড়ী বৈকালে পরিবার জন্য বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া কমলা একবার মনোরমার দিকে চাহিল। এত রূপ! অতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-প্রতিমা! স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায়, তবু সর্ব্বাঙ্গে কি অপরূপ লাবণ্য টল টল করিতেছে! চক্ষুর দৃষ্টি কি উজ্জ্বল, কি কোমল! কিন্তু হায়, সন্তোষ এমন রত্ন কেমন করিয়া পায় ঠেলিয়া দিল! সে সই, সেও তো এমনি সুন্দরী ছিল, সন্তোষের মন সেও তো বাঁধিতে পারে নাই। কমলার মনে হইল, ক্রটি কাহার? যে বাঁধিতে পারিল না, তাহার? না, যে বাঁধা পড়িল না তাহার?

মনোরমা কহিল, "অমন কোরে কি দেখচো সই, মুখে কথা নেই কেন?"

কমলা কহিল, "দেখচি তোমার রূপ! ভগবান কি নির্জ্জনে বোসে এ রূপ গড়েছিলেন? গড়েছিলেন তো পৃথিবীতে পাঠালেন কেন? পৃথিবীর লোক এ রূপ নিয়ে

কি করবে ?” ঈষৎ হাসিয়া মনোরমা চক্ষু ফিরাইয়া কহিল, “যাও, ঠাট্টা কোরচ কেন ?”

কমলা কহিল, “ঠাট্টা নয়, সত্যিই বলচি, তুমি অমন কোরে চেয়ো না বোন, আমি যদি পুরুষ হোতাম, এতক্ষণ মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম।”

মনোরমা কহিল, “মাথা ঘুরে পড়ার দরকার নেই, তাতে বুদ্ধি বিকৃত হোয়ে যায়। সই-দিদি, বলো দেখি, মানুষ রূপে মুগ্ধ হ’য়ে যে ভালবাসে তাই ঠিক, না গুণে মুগ্ধ হ’য়ে ভালবাসে তাই ঠিক ?”

কমলা কহিল, “ভালবাসা রূপ দেখেও জন্মায়, আবার গুণ দেখেও জন্মায়, কিন্তু রূপের নেশা, যে-টাকে আমরা ভালবাসা বোলে ধ’রে নিই, সেটা ভালবাসা নয় ; দু’দিনের মোহ মাত্র, তা থাকে না। কিন্তু অনেক সময়, রূপেই মুগ্ধ হ’য়ে মানুষ ভালবাসে, সেই ভালবাসা আবার অভ্যাস-গত প্রকৃতিগত হ’য়ে স্থায়ি হয়ে দাঁড়ায়।”

মনোরমা কহিল, “জগতে রূপ না থাকতো তো ভালই হোতো। আমার মনে হয়, রূপের মোহে মানুষের মন যতটা বিকৃত হয়, অমন আর কিছুতে হয় না। আর সেই বিকৃতির পরিণাম বড় শোচনীয়, নয় কি দিদি ?”

কমলা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, “না বোন, তা নয়। যদি দু’দশটা কুফল দেখে তুমি তাই বিচার করো, সেটা তো ঠিক নয়। ভগবানের সৃষ্টির চরম সার্থকতাই হোচ্ছে

সৌন্দর্য্য, তা সে যে বিষয়েই হোক্ না কেন। নর নারীর রূপ, যা দেখে লোক দেবদেবীর সৌন্দর্য্য কল্পনা করেচে, সে কি কখনো খারাপ জিনিষ হ'তে পারে? চক্ষুর সার্থকতা রূপ দর্শনে। চক্ষু যদি রূপ দেখে পবিত্রতর রূপের ধ্যান না করতে শেখে, সে চক্ষু থাকার চাইতে না থাকাই ভাল।"

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার কিন্তু মনে হইতে লাগিল, তাহার যদি এতো রূপ না হইত, তাহা হইলে সন্তোষ দর্শন মাত্র মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রয়াস পাইত না। কমলাকে কিন্তু সে আর কিছু বলিল না।

কমলা কহিল, "কার চিঠি এসেচে? সইমার লেখা না?" 'হ্যাঁ' বলিয়া চিঠিখানি মনোরমা কমলার হাতে দিল অনেক দুঃখ করিয়া তিনি কন্যাকে চিঠি লিখিয়াছেন। কমলা চিঠিখানি পড়িতে লাগিল। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—

"পরের জন্যই মেয়ে পেটে ধরে জানি। মেয়ে বিয়ে দিলেই পর হ'য়ে যায়। পরের ঘরে মনের সুখে থাকলেই বাপ মার মনে সুখ হয়। কিন্তু মেয়ে যে মাকে এমন ক'রে ভুলে থাকতে পারে, তা আমি জানতুম না। তোমার মনে যদি কোথাও আঘাত লেগে থাকে, তা কি মায়ের কাছে লুকোতে হয়? নিজের দিকটাই শুধু দেখতে শিখলে মা, আর এত দিন যে পেটে ধ'রে, এত কষ্ট ক'রে মানুষ

করলুম, আমাদের সে দিকটা একবার ভাবলে না? আমার আর সন্তান নেই, যাদের মুখ চেয়ে জুড়ুবো। আমি তোমার জন্য হা প্রত্যাশা ক'রে বসে আছি, তবু তুমি এলে না। ধন্যি পাষাণী মেয়ে!"

কি প্রাণস্পর্শী স্নেহের অনুযোগ! কমলার নিজের মাকে মনে পড়িল। বঙ্গের জননী! কি অমৃত দিয়ে ভগবান্ তাঁদের প্রাণ গড়েচেন। কন্যার নিগূঢ় বেদনা নিজের প্রাণের হা-হাকার দিয়া কৌশলে ঢাকিতে চাহিয়াছেন।

কমলার চক্ষে অশ্রু আসিল। কহিল, "সইমা তোমার জন্য কাতর হয়েছেন, দিনকতক মার কাছে গিয়ে থাক গে। আহা, মার প্রাণ, তার একটি মেয়ে।"

মনোরমা কমলার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া কহিল, "তাই যাবো মনে করচি। মা শীগ্‌গির যাবেন, মার সঙ্গে যাবো।"

এমন সময়ে সন্তোষ আসিল। মনোরমার হাতে চিঠি দেখিয়া কহিল, "কার চিঠি? হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়লো। বিনয় আমায় চিঠি লিখেচে, পিসিমাও শীগ্‌গির লিখবেন লিখেচে। তা দেখ, বিনয়কে তুমি যেন কোন দিন চিঠিপত্র লিখো না। আগে হ'তে সাবধান ক'রে দেওয়া ভাল। মেয়েমানুষকে অত স্বাধীনতা দেওয়া ভাল নয়, তাতেই বলচি।"

লজ্জায় ঘৃণায় মনোরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। ছি ছি,

এ কি অপমান! কমলাও থতমত হইল, নারীর সম্মুখে নারীর অপমান!

সন্তোষ কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বাক্স খুলিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইল। যাইবার সময় কমলাকে কহিল. "সই, হীরালাল বাবুর স্ত্রী কাল কি পরশু আমাদের বাড়ী আসবে। বাঙালীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সে এলে তোমায় ডাকতে পাঠাবো, এসো।"

সন্তোষ বাহির হইয়া গেল। কমলা দেখিল, মনোরমার মুখ যেন হঠাৎ সাদা হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয় মানসিক উত্তেজনায়! কমলা মনে মনে ভগবানকে কহিল, ধন্যবাদ তোমায় ঠাকুর! আমায় দেবতার ন্যায় স্বামী দিয়েচ, পুত্র কন্যা দিয়েচ। আর কিছু চাই না প্রভু। যেন এই সৌভাগ্যই আমার বজায় রেখে মরতে পারি। সেই একই সময়ে মনোরমার অন্তঃকরণ হইতে আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল, দয়াময়, কোন্ দোষে আমার প্রতি এ কঠোর বিধান করেচো, ব'লে দাও? দেবতা! কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তোমার সোণার সংসারে আমায় পাঠিয়েছিলে? শুধু যন্ত্রণা, উৎপীড়ন! আর যে সইতে পারছি না প্রভু!

২৩

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। যে সূর্য্য-কিরণ কয়দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মে অসহ্য পীড়াদায়ক মনে

হইতেছিল, আজ তাহার তরুণচ্ছটা কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল! সোণালী কিরণমালা বর্ষাস্নাত শ্যামল তরু-পল্লবগুলিতে হীরার ঝিলিক হানিতেছে।

অন্নপূর্ণা বধূকে লইয়া প্রাতঃস্নান করিয়া ফিরিতেছেন। বাংলার বাগানের মধ্যেই গঙ্গার বাঁধা ঘাট, সে ঘাটে অপর কেহ স্নান করিতে পাইত না। সদ্যস্নাতা মনোরমাকে নীলবসনে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। সিক্ত বস্ত্রের মধ্য দিয়া কনক-কান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। দুই পাশের গাছের মধ্যকার ছায়ান্বিত পথ দিয়া আসিতে আসিতে যখন মুক্ত স্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইল, সূর্য্য তাহার সমস্ত রক্ত-কিরণটুকু যেন পাত্র নিঃশেষ করিয়া সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিল। অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী-রূপিণী মনোরমাকে সে সময়ে যেমন সুন্দর দেখাইল, তাহা চিত্রকরের ধ্যানেরও অগোচর।

দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া শৈল মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। মনোরমা বিরক্ত হইয়া কহিল, "হাসিস্ কেন?"

শৈল অঙ্গুলি সঙ্কেতে উদ্যানের বাহিরের দিকে নির্দ্দেশ করিল। মনোরমা দেখিল, সন্তোষ, হীরালাল ও মাষ্টার।

সরম-সঙ্কুচিতা মনোরমা আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরেই শুনিতে পাইল, অন্নপূর্ণা রাগত হইয়া কহিতেছেন, "তোর কি আক্কেল সন্তোষ? বৌমা স্নান

ক'রে ভিজে কাপড়ে আসচে, আর তুই সেই সময়ে ওদের নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলি ? তোর কি কিছু আক্কেল নেই ? ছিঃ ছিঃ !" সন্তোষ কোনও উত্তর না দিয়া গৃহে আসিল।

সন্তোষ মনোরমাকে কহিল, "তুমিও রাগ করেছ না কি ? আজ মস্ত একটা বাজী জিতেচি, নগদ দুশো ! মুখ ফিরুচ্চো কেন ? আগে সবটা শোনোই ? হীরালালের সঙ্গে বাজী ছিল, কার স্ত্রী বেশি সুন্দরী। যে হারবে সে দুশো টাকা দেবে। মাষ্টার মধ্যস্থ হন। হীরালাল তার স্ত্রীকে ডেকে পাঠায়. আমি সে ঘরে ছিলাম. তা সে জানতো না। এসে পড়লো, আমায় দেখে পালিয়ে গেল। এইবার আমার পালা। আমি শৈলকে বল্লুম, ওরা যখন স্নান করতে যাবে, আমায় খবর দিস্। সে আমাদের খবর দিতেই আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলুম। তা আমিই জিতেছি। হীরালাল তোমায় দেখে অবাক্ হ'য়ে গেছে। বলে মুখের গঠন এমন নিখুঁত সুন্দর, তাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।"

মনোরমা কহিল, "তা বেশ করেচ, তোমার যোগ্য কাযই তুমি করেচ। শৈলকে আজ এখুনি বিদেয় করচি।"

মনোরমা বাহির হইয়া যায় দেখিয়া সন্তোষ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "ছাখো, ওকে কিছু বোলো না। ওর দোষ নেই, আমার হুকুম পালন করেচে। আমি মনিব, যা বলবো, তাই তো করবে ?"

মনোরমা তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, "আর আমিও কি মনিব নই?" আমার অপমান স্বচ্ছন্দে ও কোরবে? এত বড় আস্পর্দ্ধা?"

সন্তোষ হাসিয়া কহিল, "তুমি মনিব কার সম্পর্কে? আমারই সম্পর্কে তো? আচ্ছা, শৈলকে তাড়াতে চাও তাড়িয়ো। এখন তোমার কাছে আমার একটা কথা আছে। হীরালালের স্ত্রীর শরীর খারাপ, সে আজ আস্‌তে পারবে না, আর একদিন আস্‌বে। তুমি আর মা আজ তাদের বাড়ী যাবে, প্রস্তুত থেকো, পাল্কী পাঠাবো।"

সিংহিনীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া মনোরমা কহিল, "কখনো না, আমি কারো বাড়ী যেতে চাই না। আমি আজ কলকাতায় যাবো। আমাকে নিয়ে চলো, নয় পাঠিয়ে দাও।"

সন্তোষ হাত চাপড়াইয়া, শিস্ দিয়া কহিল, "বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে। ফণা ধরতে শিখ্‌চ দেখ্‌ছি! কলকাতায় যাবে কি? তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌বো কি ক'রে?"

"ঠাট্টা রাখো, আমি আজ যেতে চাই-ই।"

"যেতে পাবে না, পাবে না, দিব্বি ক'রে বল্লুম। মাকে পাঠিয়ে দিতে বলো, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্চি। ভাল চাও তো চুপ চাপ ক'রে থাকো। মেয়েমানুষের এত একগুঁয়েমি ভাল নয়, মেরে হাড় ভাঙবো।"

সন্তোষ বাহির হইয়া গেল। মনোরমা গিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, "মা, শৈলকে আজই বিদেয়ই করুন। আর

"কালিসিংকে দিয়ে বাবাকে তার করুন, তিনি তার পেয়েই চ'লে আসুন, আমি আজই কলকাতায় যাবো।"

অন্নপূর্ণা কখনো বধূকে উত্তেজিত হইতে দেখেন নাই। তিনি ভীত হইলেন। শৈলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি বাছা বাড়ী যাও, এখানে তোমার পোষাবে না। গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝির মান রাখ্‌তে জান না, নিজেদের মতন সবাইকে মনে করো।"

শৈল চটিয়া লাল হইল, উচ্চরবে কহিল, "গতরে খেটে খাবো, কাযের ভাবনা আমরা করি না। এক দুয়োর বন্ধ হ'লে শতেক দুয়োর খোলা। আমরা হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল করি। যাদের বাড়ীর মেয়ে বৌ, তাঁরা যদি ইজ্জত না রাখ্‌তে চান, তো আমাদের কি দোষ? আমি এই চল্‌লুম।"

রাগে গরগর করিতে করিতে শৈল চলিয়া গেল। মনে মনে ইচ্ছা, গৃহিণী আবার ফিরিয়া ডাকিবেন। এমন চাকুরী খোয়াইতে তাহার ইচ্ছা নাই। পাওনা খুব বেশি, কায খুব কম,—কিন্তু কেহই ডাকিল না।

২৪

গ্রীষ্মের ছুটিতে বিনয়কুমার মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। ছুটি ফুরাইয়াছে, দু-এক দিনে জব্বলপুরে ফিরিতে হইবে।

ক্ষীরোদের ইচ্ছা ছিল, এই ছুটিতে পুত্রের বিবাহ দিয়া নববধূ লইয়া যান, কিন্তু বিনয় সম্প্রতি বিবাহে নারাজ। রমাকান্ত বাবুর বাড়ীতে তাঁহারা অতিথি হইয়াছেন।

মনোরমার মাতা বিনয়কে ছোট্টটি দেখিয়াছিলেন। এখন সে বলিষ্ঠ দেহ, দীর্ঘকায়, সুন্দর যুবক হইয়াছে। কথাগুলি সুমিষ্ট ও নম্রতা পূর্ণ ব্যবহার অতি ভদ্র। বিনয়কে যদিও তিনি যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু বহুদিন কাছ-ছাড়া হওয়ায়, সে স্নেহের আর বড় বেশি সাড়া শব্দ ছিল না। আজ কিন্তু হঠাৎ এই বারো দিনের ঘনিষ্টতায় বিনয় তাঁহার পুত্রের স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বিনয়ের মত যদি তাঁহার একটি পুত্র থাকিত!

মনোরমার দুই একদিনেই আসিবার কথা আছে। ক্ষীরোদার ইচ্ছা, যাইবার পূর্ব্বে মনোরমাকে দেখিয়া যান। ক্ষীরোদা সুখময়ীর নিকট সন্তোষের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় সকলি বলিলেন। হতভাগিনী জননী, কপালে করাঘাত করিতে করিতে প্রাণাধিক কন্যার নির্য্যাতন-কাহিনী সমস্তই কহিলেন। ইষ্ট-দেবতার চরণে অনেক মাথা খুঁড়িয়া জামাতার মন পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কুল-পুরোহিত, যিনি মনোরমার বিবাহের সময় গরদের জোড় পাইয়া বলিয়াছিলেন, "বৌ-মা, আমার কথা মিথ্যে হবে না, তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে।" তাঁহাকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। তিনি আসিলে, প্রণামান্তে তাঁহাকে সকলি কহিলেন, "এখন কি উপায় করি বাবা? আমাদের ক্ষমতায় কিছু নেই, দেবতার কৃপা ভরসা মাত্র। আমার মনুর কপালে কি এই ছিল?"

"কেঁদো না মা" বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া পুরোহিত কহিলেন, "গ্রহ-দেবতার কোপে বোধ হয় এরূপ হয়েছে। আমি স্বস্ত্যয়ন কোরবো, তুমি আয়োজন করো। দেবতাকে প্রসন্ন করতেই হবে। মনুর মত সুলক্ষণা মেয়ে কথনই কষ্ট পাবে না, জামাই বাবাজীর মন ফিরাতেই হবে।"

সুখময়ী সাহসে বুক বাঁধিয়া আয়োজন করিলেন। সকাল হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সমারোহে স্বস্ত্যয়ন চলিতে লাগিল। পূজান্তে দুইজন নারী ভক্তি ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে দেবতার চরণে প্রণত হইয়া কন্যার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। বিনয় একদিন হাসিয়া কহিল, "মামীমা, আপনার দেবতার পূজার চাইতে বরং পত্যক্ষ শরীরী জামাই দেবতাটিকে দিন কতক নিয়ে এসে চা'ল কলার নৈবিদ্য খাইয়ে দেখুন, যদি লোভে প'ড়ে অন্য জিনিষের স্বাদ ভুলতে পারেন। সত্যি বলচি মামীমা, তাকে যদি দিন কতক এনে এখানে রাখ্‌তে পারেন, একেবারে কারো সঙ্গে না মিশ্‌তে পায়, তা হলে সে শুধ্‌রে যেতে পারে। মামাকে বলেছিলুম, তিনি তো রাজী নন্‌। সন্তোষের স্বভাবটা আমি বেশ জেনেছি, বড় দুর্ব্বল, আর বড় খামখেয়ালী।"

সুখময়ী কহিলেন, "আমাদের হাতে বাবা কোনো উপায় নেই। ভগবানের খেলার পুতুল আমরা! তিনি মুখ তুলে চান তো ভালই হবে। নইলে আর কি কোরবো? উনি তো বল্‌চেন মেয়ে একবার পেলে আর পাঠাবেন না। কিন্তু শুধু মেয়ে নিয়ে কি কোরবো, তার আখেরটাও তো দেখ্‌তে হবে? স্বামী যদি ফিরে চেয়ে না দেখ্‌লেন, তবে আর জীবনটায় কি ফল?"

বিনয় কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল, এই যে অপূর্ব্ব বিধান, অবশ্য এ বিধান ভগবানের গড়া নয়, মানুষেরই তৈরি। স্বামীর ভালবাসাই যদি নারী-জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তবে সেই সতী রমণীর প্রণয় কেন পুরুষও তেমনি বাঞ্ছনীয় মনে করে না? অথবা পুরুষ জানে, সে-টা তার নিতান্তই নিজস্ব পাওনা, তাই সে দিক্‌টায় নিশ্চিন্ত থেকে উপরি পাওনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হায় রে উপরি পাওনা!

পুরাতন বৃদ্ধা দাসী দয়া, মনোরমা তার বড় আদরের। সে মূর্খ স্ত্রীলোক, সে বলিয়া বসিল, "আর অমন জামাইয়ে কাজ নেই মা, কোন্ দিন মেয়েটাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে হয় তো। মেয়েকে আগু নিয়ে এসো। আমাদের গাঁয় চাটুর্য্যেদের বাড়ী, মুখুয্যেদের বাড়ী গণ্ডা গণ্ডা ঝিউড়ী মেয়ে ছিলো, তারা শ্বশুরবাড়ী তো কোনো কালে চোখেও দেখে নি, মাঝে মাঝে কচিৎ জামাই

যদি আস্‌তো তো, তবেই সোয়ামীর সাক্ষাৎ পেতো।"

দয়ার কথায় সুখময়ী উত্তর দিলেন না। তাঁহার মাতৃস্নেহও বুঝি এই কথাই বলিতেছে! কিন্তু কর্ত্তব্য? নারী হইয়া তিনি কেমন করিয়া নারীকে তাহার কর্ত্তব্যের পথ হইতে সরাইবেন? ভগবান তাহার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন কেন? রমাকান্ত বাবু যখন কন্যাকে আনিতে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন কিন্তু সুখময়ীর প্রাণে বড় বাজিল। শাশুড়ীর জন্য কন্যা আসে নাই, দু' একদিনে আসিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছে। এইবার মাতৃস্নেহের অভিমান হইল। স্বাভাবিক স্নেহবৃত্তিকে কর্ত্তব্য যেন ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কন্যার এ কর্ত্তব্য বোধে জননী একটু সুখী হইলেন; কিন্তু ব্যথা যা পাইলেন, তুলনায় তাহাই বেশি হইল।

কন্যাকে তিনি সেই জন্যই অভিমান ভরে চিঠি লিখিলেন। মনু তার উত্তরে যা লিখিল, তাহাতে জননীর অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল। মনোরমা লিখিয়াছে, "মা, আমি শীঘ্রই যাচ্ছি, তোমরা একটুও ভেবো না। তোমরা মা হ'য়ে যে, এতদিন ধ'রে মানুষ ক'রে কেমন ক'রে একেবারে পর ক'রে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো, তা তো আমি বুঝ্‌তে পারি না। আমার সেই ময়ূরটা ম'রে গেছে, কিন্তু এখনো তার

পালকগুলা আমি আমার মুখে গায়ে বুলিয়ে আরাম পাই। তাকে আমি কত ভালবাসতুম, তা তো তুমি জানো মা। ছেলে-মেয়েকে তো লোকে তার চাইতে ঢের বেশী ভালবাসে। আমি কিন্তু প্রাণ থাক্‌তে তাকে কাউকে দিতে পারতুম না। মরে গেছে তাই হাত নেই। বাবাকে বোলো মা, তোমাদের পাগলী মেয়ে আবার শীগ্‌গির তোমাদের কোলে ফিরে যাচ্ছে। তোমাদের কোল ছাড়া জগতে আর তার কোথাও ঠাঁই নেই, সেই কোলই তার স্বর্গের চাইতে বড়।" সুখময়ীর চোখের উপরে মনোরমার শৈশব-জীবনের প্রত্যেক খুঁটি-নাটি খেলাগুলি ভাসিয়া উঠিল, আদরিণী কন্যার অভিমান জননীর স্নেহধারাকে শতমুখে উৎসারিত করিয়া তুলিল। সাগ্রহে তিনি কন্যার আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন।

২৫

অফিস গমনোদ্যত স্বামীকে সুখময়ী কহিলেন, "আমায় আর গোটাকতক টাকা আজ দিয়ে যাও, পূজোর কয়েকটা জিনিষ আরও কিন্‌তে হবে।" রমাকান্ত বাবু একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওবেলা এনে দেবো না হয়, অফিসের বেলা হোয়ে যাচ্ছে, তোমার যত সব পাগলামী!"

সুখময়ীর রাগ হইল। তিনি কহিলেন, "পাগলামীটা

কি হোলো ? দেবতার কাছে মানসিকটা কি পাগলামী ? আমার অতো জ্ঞান নেই, পাণ্ডিত্য নেই। আমি মূর্খ মেয়ে-মানুষ, এই শুধু বুঝি, প্রাণে যা দুঃখু কষ্ট পাবো, মায়ের কাছে জানাবো, তিনি অবশ্য মুখ তুলে চাইবেন।"

ঈষৎ হাসিয়া রমাকান্ত বাবু কহিলেন, "তা শুধু জানালে তিনি জানছেন কই ? তাঁর কাপড় চোপড়, থালাভরা চা'লকলা সন্দেশ না হোলে তো তিনি জানার পরিচয় দিতে চান না ?"

সুখময়ী রাগভরে কহিলেন, "শাস্ত্র যাঁরা গড়েছেন, তাঁরা তো মূর্খ নন। তাঁরাই তো সোপকরণ পূজার বিধি করেছেন। তোমরা সে বিধি উল্টে দিলে চলবে কেন ?"

রমাকান্ত বাবু কহিলেন, "আমি কি তাঁদের মূর্খ বলচি ? আমার ঐ স্বস্ত্যয়নে বিশ্বাস নেই। হোতে পারে ওতে মনের তৃপ্তি পাওয়া যায় : কিন্তু যে মঙ্গলকামনা কোরে কোরচ, তা যে কতদূর ফলবতী হবে তা জানি না, টাকা তুমি বিনয়ের কাছে থেকে নিয়ো, আমি ও বেলা এসে দেবো।"

রমাকান্ত বাবু অফিসে চলিয়া গেলেন। সুখময়ী স্বস্ত্যয়নের পর যখন শান্তি-জল লইয়া উঠিয়াছেন, সেই সময়ে ডাকপিয়ন একখানি টেলিগ্রাম আনিল। বিনয় সহি করিয়া লইবামাত্র পিয়নটা বকসিস্ চাহিল। সুখময়ী ও ক্ষীরোদা উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, "কোথা থেকে তার এলো, শীগ্গির পড়ো বাবা।"

চকিতে বিনয়ের মুখ কাগজের মত শাদা হইয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, একখানি টুলের উপর সে বসিয়া পড়িল। ক্ষীরোদা কহিলেন, "কি হোয়েছে বিনয়, কি খবর বলো না বাবা ?"

বিনয় কহিল, "বোলবো আর কি মামীমা, সর্ব্বনাশ হোয়েছে, মনোরমা আত্মহত্যা কোরেছে।"

(পলকে পৃথিবীর সকল জ্যোতিঃ গভীর নীল অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সুখময়ী কঠিন ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়িলেন।)

ক্ষীরোদা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। দয়া আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল। বিনয় সুখময়ীর চৈতন্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইল। ক্ষীরোদা কহিলেন, "থাক্‌কু অমনি অচৈতন্য অবস্থায়, জ্ঞান হোলে কেমন কোরে এ যাতনা সহ্য কোরবে ? সন্তান শোক যে বড় ভয়ানক রে।"

বহরমপুর হইতে কমলার স্বামী খগেন্দ্রনাথ রমাকান্ত বাবুকে টেলিগ্রাম করিতেছেন ;—

"On Monday night, Monorama commited suicide, doubtful.

সন্দেহজনক কথাটিতে বুঝাইতেছে যে আত্মহত্যা কি তাহা ঠিক নাই।

অনেকক্ষণ পরে সুখময়ীর জ্ঞান হইল, কিন্তু না হইলেই বুঝি ভালো ছিল। কপাল কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতেছে। ক্ষীরোদা কাঁদিতে কাঁদিতে জলপটি বাঁধিতে গেলেন, সুখময়ী তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আমার প্রাণ ফেটে যে রক্ত পড়চে সেই রক্তের ধারা আগে বন্ধ কোরে দাও ঠাকুরঝি! ও বাবা বিনয়, আমার মনুকে ফিরিয়ে এনে দে বাবা, আর আমি যাকে চোখের আড় কোরবো না। আমার অন্ধের যষ্টি, আমার চোখের মণি এনে দে তোরা! সে আমার মরবার মেয়ে নয়, মাকে ফেলে সে কোথাও যাবে না। তাকে কেউ লুকিয়ে রেখেছে, বের করে এনে দে বাবা।"

বিনয়েরও দুই চক্ষু প্লাবিত হইয়া গেল। কাতরকণ্ঠে কহিল, "পাগল হোয়ো না মামীমা, এমন চোরে সে জিনিষ চুরি কোরেছে, যেখানে কারো দাবী দাওয়া চলে না।" ক্ষীরোদা সুখময়ীর ধূলিধূসরিত দেহ কোলে টানিয়া লইতে গেলেন। উন্মত্তভাবে সবলে সুখময়ী তাঁহাকে আবার ঠেলিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "সান্ত্বনার কথা বোলো না ঠাকুরঝি, প্রাণভরে একবার কাঁদতে দাও। ওঁকে ডেকে আনো বিনয়। দুজনে একবার আছড়ে পড়ে কেঁদে দেখি, তাকে ফিরিয়ে পাই কি না। আমার মনু পাথরে গড়া নয়, বাপ মায়ের এ কান্না তার কাণে গেলে, সে দৌড়ে এসে বুকের উপর পড়বে।"

ক্ষীরোদা বুঝিলেন, সত্যই এখন সান্ত্বনা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

বিনয় উঠিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই কি সংসার? ভগবানের রাজ্যে এমন সব বিসদৃশ ঘটনা ঘটে কেন? কেন এ হানাহানি? কেন এ রক্তপাত? কেন এ ঘৃণ্য নৃশংসতা? সে আত্ম-হত্যা কোরেছে? কেন? কিসের দুঃখে? জগতের এত পথে এত নরনারী যাত্রা কোরে চোলেছে। তার একটা পথ বন্ধ হোয়েছিল বোলে সেই ক্ষোভে সে এই দুর্লভ মানব জন্ম, ভগবানের এমন সুন্দর দান নষ্ট কোরলে? নষ্ট করবার তার কি অধিকার ছিল? নিশ্চয়ই সে আত্মহত্যা করেনি। সন্তোষই তাকে হত্যা কোরেছে, ঝোঁকের মাথায় এমন কোরে মেরেছে। বিনয়ের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল, হতভাগ্য হত্যাকারীর শাস্তির কথা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

* * * * *

* * * * *

শোকের প্রথম বেগ বড় জোরে আসিয়া মানুষের বুকে লাগে। তার পর সে প্রচণ্ড আঘাতও সহিয়া যায়। প্রাণাধিকা কন্যার শোচনীয় মৃত্যুতে স্নেহময় পিতামাতার প্রাণে বড় গভীর দাগা দিল, কিন্তু মানুষের হৃদয় সর্ব্বসহ। রমাকান্ত বাবু বড়ই কাতর হইলেন। কন্যার মৃত্যুখবর

ভালোরকম জানিবার জন্য তিনি খগেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিলেন। উত্তরে তিনি লিখিলেন, "যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর প্রতিবিধান নাই। বোধ হয় সন্তোষই মনোরমাকে নেশার ঝোঁকে হত্যা করিয়াছে; কিন্তু চক্রান্তে আত্মহত্যা সাব্যস্ত হইয়াছে, আপনার দুরদৃষ্ট। ভগবানের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সকলি সহ্য করিতে হইবে।"

রমাকান্ত বাবু চিঠিখানি বিনয়ের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দুই হাতে কপাল টিপিয়া কহিলেন, "উপায় নেই, প্রতিবিধান নেই। তাকে ফাঁসী দিলেও আমার মেয়ে আর ফিরিয়ে পাবো না। সে হত্যা কো'রও স্বচ্ছন্দে মানুষের আদালতে প্রমাণাভাবে খালাস পেলে। কিন্তু ভগবানের আদালতে কি হবে তা জানি না। শুধু এইটুকু জানছি, আমার মতন আবার কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগা তার মত সুপুরুষ বিদ্বান্ ধনবান জামাইকে আদর কোরে মেয়ে দেবে। বিনয়, এই আমাদের দেশের অবস্থা? মেয়ে আমাদের এমনই খেলার পুতুল? বারো বছরে পা দিলে মেয়ে আমাদের এমনি গলগ্রহ হয় যে, তাকে আমরা বাড়ী থেকে বিদেয় না করতে পারলে খেয়ে সুখ পাই না, ঘুমিয়ে শান্তি পাই না? উঠ্‌তে বসতে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়!"

রমাকান্ত বাবুর দুই চক্ষে অগ্নিকণা জ্বলিতেছিল, বিনয়ের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "বলো বিনয়, এর কি প্রতিকার নেই?"

বিনয় স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, "মামাবাবু, মনে কোরেছিলাম, বিয়ে কোরবো না। কিন্তু দেখছি পরকে উপদেশ দিয়ে যে কায না করা যায়, নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলে সে কাজ বেশি করা হয়। আমি বিয়ে কোরবো। ভগবান্ যদি আমার পুত্রকন্যা দেন, তবে আমি আমার সাধ্যমত তাদের সামনে এমন আদর্শ ধোরবো, যাতে তারা সে আদর্শ কতকটাও নিজেদের জীবনে ধোরে চল্‌তে পারে; তাতেই আমার জীবনের কায হবে।"

পাশের ঘরে সুখময়ী তখন করুণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছিলেন, "ওমা মনু, অভিমান কোরে কি চোলে গেলি? একবার ফিরে আয় মা? দয়াময়ী দুর্গে, আমার যে বড় বিশ্বাস ছিল, আমার মনু তোমার দয়ায় চিরদিন আমাদের কোল জোড়া কোরে থাকবে, সে বিশ্বাস পাষাণ প্রাণে কেন ভেঙে দিলে মা! আমি তো তোমার পায় কোনও অপরাধ করিনি মা!"

রমাকান্ত বাবুর দুই চক্ষু বাহিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল, মাতার এ হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, পিতার এ মর্ম্মস্পর্শী করুণ ক্রন্দন বিশ্ববিধাতার সিংহাসনতলে পৌঁছছিল কি?

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই, আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহান উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থে, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি এক সঙ্গে বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৷৵০ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ৸৴০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "**গ্রাহক-নম্বর**" সহ পত্র দিতে হইবে:

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

১। অভাগী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

৩। পল্লীসমাজ (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।

৫। বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।
৭। দূর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। বড়বাড়ী (৭ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।
১০। অরক্ষণীয়া (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (৩য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
২০। ছালদার বাড়ী (২য় সং)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক (২য় সং)—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ।
২৩। সুখের ঘর (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ।

৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

৩১। নীল মাণিক (২য় সং)—রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট

৩২। হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

৩৩। মায়ের প্রসাদ (২য় সং)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩৪। ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—(২য় সংস্করণ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।

৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (৩য় সংস্করণ) রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ।

৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী-সম্পাদক।

৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল।

৪৮। ছবি (২য় সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৯। মনোরমা (২য় সং)—শ্রীমতী সরসীবালা দেবী।

৫০। সুরেশের শিক্ষা (২য়সং)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

৫১। নাচওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।